ভগবানের ভাইবোন

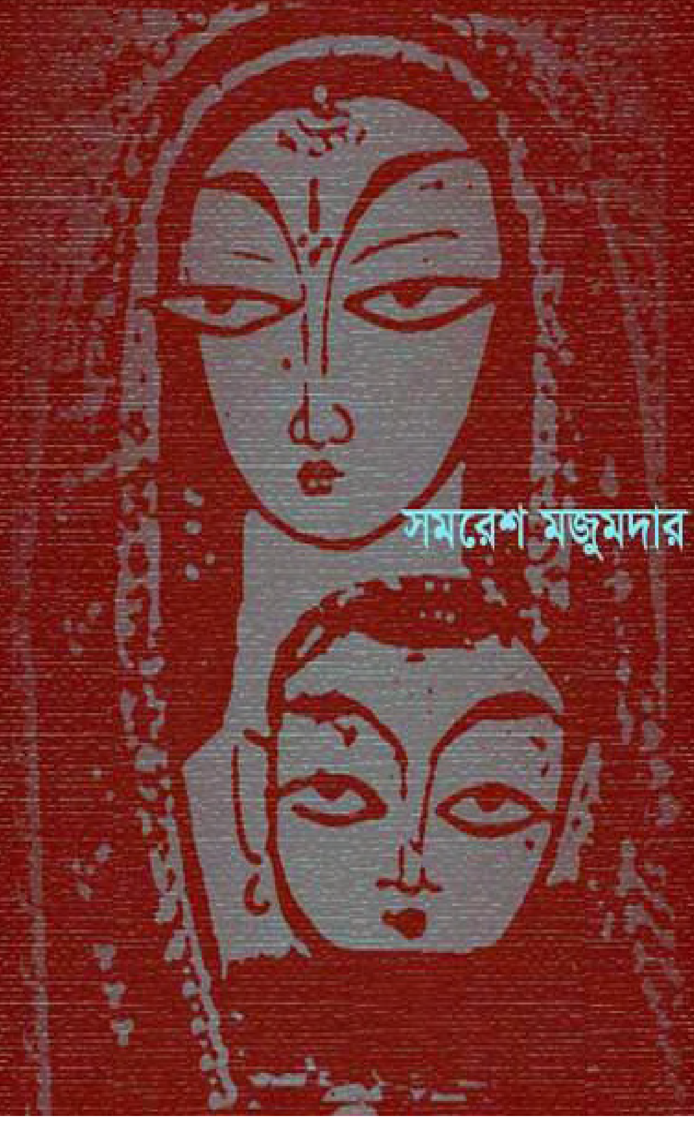

সমরেশ মজুমদার

ভগবানের ভাইবোন

সমরেশ মজুমদার

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর ১৯৬৪

মুদ্রাকর :
মহাকালী প্রেস
শ্রীকালি চরণ দাস
১৯/ই গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আশুতোষ গুপ্ত
প্রীতিভাজনেষু

হাঙরের পেটে হিরে

১

আজ ব্রেকফাস্টের পর অনেকটা সময় গেল শুধু মিটিং করতে। মেজরের মানহাটান ফ্ল্যাটে এসেছিলেন এফ বি আই-এর দু'জন বড় অফিসার। লাইটার উদ্ধার করার পর অর্জুনের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁরা বেশ চিন্তিত। যে দলটা ওই লাইটার-চক্রান্তে সক্রিয় ছিল, তারা এখন গা ঢাকা দিয়েছে বটে, তবে নিশ্চয় তাদের আক্রোশ থাকবে অর্জুনের ওপর। সেক্ষেত্রে নিউইয়র্কের রাস্তায় যদি ওর কিছু হয়ে যায়, তবে তা হবে আমেরিকান সরকারের লজ্জা। মিস্টার হোপ, অফিসারদের একজন, বারংবার বলছিলেন, অর্জুন যদি আগেভাগে তার ট্যুর-প্রোগ্রামটা ওঁদের জানিয়ে দেয়, তা হলে ওঁরা সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে অর্জুনের খুব হাসি পাচ্ছিল। জলপাইগুড়ির বেকার ছেলে নিউইয়র্কে এসে হঠাৎ খাতির পাবে, তা কে জানত। তারও আবার ট্যুর-প্রোগ্রাম। মেজর অবশ্য খুব গম্ভীর মুখে আলোচনা চালাচ্ছেন, কিন্তু সে হাঁপিয়ে উঠছিল। পুলিশের পাহারায় এদেশে থাকার চাইতে দেশে ফিরে যাওয়া অনেক ভাল। দিন-দশেক হল সে আমেরিকায় এসেছে। নিউইয়র্কটাই ভাল করে দেখা হয়নি। মেজরের হাতের রান্না আর ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গার খেয়ে পেটে ইতিমধ্যেই চড়া পড়ে

গেছে। শুধু ওই ম্যাকডোনাল্ডে যে বিশাল মুখবন্ধ কাগজের গ্লাসে মিল্কশেক নামের জমানো মিষ্টি দুধ পাওয়া যায়, তার জন্যেই এদেশে থাকা যায় বলে তার মনে হচ্ছে। তা পুলিশ-পাহারায় থাকতে হলে সে ওই মিল্কশেকের লোভও ত্যাগ করতে পারে।

মিস্টার হোপ বললেন, "আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের দেশের সুন্দর জায়গাগুলো বেড়িয়ে আসতে পারেন। এই ধরুন, লস অ্যাঞ্জেলিস্। আপনার আপত্তি না থাকলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারি। ওখানে গেলে মনে হয় কোনওরকম ঝামেলার আশঙ্কা কম।"

লস অ্যাঞ্জেলিস্। নামটা কানে যাওয়ামাত্র মন চনমনে হয়ে উঠল। পরিরা হারিয়ে গেছে নাকি সেখানে? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল অফিসাররা অনর্থক চিন্তা করছেন। অমল সোম কখনওই কোনও অপরাধীকে ধরার পর তার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন না। রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন তিনি প্রায়ই বলতেন, 'অন্যায়ের ছুরির কোনও বাঁট নেই।' যে আঘাত করে, সে নিজেও রক্তাক্ত হয়।

অফিসাররা ওঠার আগে ওদের চিন্তা করতে বললেন। মিস্টার হোপ অর্জুনকে একটা কার্ড দিয়ে গেলেন। সেই কার্ডে লেখা রয়েছে, এই ভদ্রলোককে সাহায্য করা মানে, তা আমেরিকান সরকারকে সাহায্য করার সামিল হবে। বললেন, কখনও বিপদে পড়লে যে-কোনও পুলিশ অফিসারকে ওটা দেখালেই কাজ হবে।

ওঁরা বিদায় নেবার পর মেজর সোজা উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত ওপরে ছুঁড়ে আলস্য ভাঙলেন। তারপর একটা কোকাকোলার টিন ফুটো করে পুরোটা গলায় ঢাললেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার খিদে পায়নি?"

"পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বকর-বকর করতে করতে। ভিজিয়ে নিলাম। আঃ। এবার বলো তো কী রাঁধি?"

অর্জুন আতঙ্কিত হল, "রান্নার কী দরকার। চলুন না বাইরে গিয়ে খাই।"

"ম্যাকডোনাল্ডে? মিল্কশেক?" মেজর গলা ফাটিয়ে হাসলেন, "কত ক্যালরি আছে জানো ওতে। রোজ খেলে পিপে হয়ে যাবে দু'দিনে।"

অর্জুনের মেজাজ খারাপ হল। যেন মিল্কশেক না-খেয়ে উনি মোটা হচ্ছেন না! মেজর বললেন, "আমি হেনরিকে আসতে বলেছি এখানে। ওকে লাঞ্চ খাওয়াব।"

"কে হেনরি?"

"হেনরি!" চোখ বড় করলেন মেজর, "আমার বন্ধু! আমার অভিযানের পার্টনার। ওর জন্যে কালিম্পং থেকে সেই রেয়ার পপিটা এনেছি। তিরিশ দিন আমি আর হেনরি আমাজনে ডিঙি-নৌকোতে ছিলাম, আল্পসের তুষার-ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম সাতদিন, হেনরি আমাকে খুঁজে বার করেছিল। হেনরি ডিমক। এক নম্বরের পাগল। কিন্তু ও তো লেট করে না। দাঁড়াও, দেখছি।" মেজর উঠে টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। তার ছাড়াই ঘরের যে-কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে ফোন করা যায়।

"হাই হেনরি! পাজির পা-ঝাড়া! আমার এখানে লাঞ্চ খেতে আসবে বলে ওখানে কোন্ রাজকার্য করছ!...কী?...কথা বলতে পারছ না? এত বড় আস্পর্দা?...কী?...ওয়াচ করছ? ছাই-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।...চলে আসব? বয়ে গেছে আমার। রাবিশ।" টেলিফোন নামিয়ে রেখে নিজের মনেই মেজর চিৎকার করে উঠলেন, "বন্ধু না ঘেঁচু! সেবার গ্লেসিয়ার থেকে যখন পড়ে গিয়েছিল, তখন আমি না টেনে তুললে আজকে ওয়াচ করা বেরিয়ে যেত!"

অর্জুন অবাক হয়ে শুনছিল। মেজরকে সত্যি খুব রাগী দেখাচ্ছে। আঙুলের ডগায় দাড়ি চুলকোচ্ছেন আর গজর-গজর

করছেন। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, "উনি কী রিসার্চ করছেন?"

"হিরে। কাচ ভেবে কিনেছিল।" মেজর মুখ বিকৃত করলেন।

"মানে?" অর্জুন হতভম্ব। এতদিন শুনে এসেছে লোকে হিরে ভেবে কাচ কেনে, আর এ যে শুনছে উলটো।

মেজর আর একটা কোকাকোলা গলায় ঢাললেন। "অকৃতজ্ঞ, বেইমান! এত বড় একটা এক্সপেরিমেন্ট আমাকে বাদ দিয়ে করছে। অথচ আমার প্রতিটি ব্যাপারে আমি ওকে আগেভাগে খবর দিই। লেট্'স গো! চলো তো, মুখের ওপর কথাগুলো শুনিয়ে আসি। "এরকম বন্ধুর দরকার নেই আমার।"

মেজর লাফিয়ে উঠতেই টেলিফোন বেজে উঠল। "ব্যাটা বোধহয় আমাকে চাইছে। বলবে, বাড়িতে নেই, কথা বলতে চাই না!"

অগত্যা অর্জুন রিসিভার কানে তুলল, "হ্যালো?"

"কে? তৃতীয় পাণ্ডব? কেমন আছ?" বিষ্টুসাহেবের গলা।

অর্জুন অবাক, "ভাল। আপনি কেমন? .কাথেকে বলছেন?"

"হাসপাতাল থেকে। বেড়ে শুয়েই এদেশে টেলিফোন করা যায়।"

"আপনি ঠিক আছেন?"

"না হে। এ বন্দী-দশা আর সহ্য হচ্ছে না। কালিম্পং বড় টানছে আমাকে। ডাক্তাব বলছে আমি ভাল হব। কবে হব কে জানে! তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? বিদেশ বিভুঁই! বিষ্টুসাহেবের গলাব স্বর অর্জুনের মন জুড়িয়ে দিল।

"বলছেটা কে?" মেজর এগিয়ে এলেন।

"বিষ্টুসাহেব!" অর্জুন মেজরকে রিসিভারটা দিল।

"অ। শুনুন। হাসপাতালে শুয়ে বকর-বকর করাটা ঠিক নয়।···কী বললেন?···না, না, আমার মেজাজ ঠিক আছে।··· অর্জুনকে ভাল-মন্দ খাওয়াচ্ছি কিনা? আশ্চর্য! আপনি আমাকে কী ভাবেন বলুন তো? কাল ডিনারে চিংড়ি মাছের সস্‌প্যান

চচ্চড়ি করেছিলাম তা জানেন ?…যাব দেখতে আপনাকে।—নো, নো, নো এক্সপিডিশন।"

মানহাটান থেকে বেরিয়ে সোজা টাইম স্কোয়ারের দিকে হনহনিয়ে হাঁটছিলেন মেজর, পিছনে অর্জুন। কোথায় যাচ্ছে, তা সে জানে না। খিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে। টাইম স্কোয়ারটা ঠিক কলকাতার মতো। ফুটপাতে হকার, চিৎকার চেঁচামেচি। বেশির ভাগ নিগ্রো এ-তল্লাটে। সে দ্রুত পা চালিয়ে মেজরকে জিজ্ঞেস করল, "হার্লেমটা কতদূর ?"

মেজর থমকে দাঁড়ালেন, "কেন ? সেখানে কী দরকার ?"

"চার্লসের খোঁজে গেলে হয়। চার্লস বলেছিল সে হার্লেমে থাকে।"

"অ। দ্যাট গ্রেট থিফ্। জোন্স অ্যাণ্ড জোন্সের পুরস্কারের টাকাটার শেয়ার নিয়ে ব্যাটা হাওয়া হয়ে গেছে না ? কিন্তু হার্লেম পরে হবে। ডেঞ্জারাস জায়গা।"

মেজর কেন 'ডেঞ্জারাস' বললেন, তা জানে অর্জুন। হার্লেম হল নিউইয়র্কের একটা অঞ্চল, যেখানে নিগ্রোরা থাকে। সাদা চামড়ার লোকজন বলে, সেখানে নাকি পৃথিবীর সব রকমের অপরাধ নিত্য ঘটছে। খুন-জখম তো জলভাত। সাদা চামড়ার মানুষ সহজে যায় না সেখানে। লাইটার উদ্ধারে যার সাহায্য পেয়েছি, সেই চার্লস অবশ্য তাকে বলেছে, এ-সব সাদাদের বানানো গল্প। তিলকে তাল করা।

ভিড় ছাড়িয়ে দু'পা এগোতেই ডাক ভেসে এল, "হেই মিস্টার।"

মেজর দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুন দেখল, ওপাশের রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে তিনজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে। দু'জন সাদা, একজন কালো। তিনজনের শরীরেই ময়লা স্যুট। মুখে না-কামানো দাড়ি। বয়স্কতম যিনি, তিনি কালো প্রৌঢ়টিকে দেখিয়ে মেজরকে বললেন, "হোয়াই ডোণ্ট হেল্প ইওর ব্রাদার ? ওকে তিনটে ডলার দাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর পা চালালেন, "চলে এসো। ব্যাটারা ভিখিরি।"

ভিখিরি? অর্জুন হাঁ হয়ে গেল। এ কী রকম ভিক্ষের ধরন! ওরা চলে যাচ্ছে দেখে তিনজনেই তারস্বরে গালাগাল দিতে লাগল। যার একটা শব্দ কানে গেলে নিজেকে সামলানো দায় হয়, তা শুনেও মেজর জায়গাটা পেরোতে পেরোতে বললেন, "মেরে ব্যাটাদের ক্যালেণ্ডার করে দিতে পারতাম। কিন্তু কাকে মারব? কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়।" একটু থমকালেন তিনি, "তারপরের লাইনটা যেন কী হে?"

অর্জুন জবাব দিল না। তার নিজেরই রাগ হচ্ছিল। ভিক্ষে না পেয়ে যে-দেশের ভিখিরিরা অমন গালাগাল করে, তাদের ক্ষমা করাটা কখনওই উচিত নয়, মানুষেব শোভা না পেলেও।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন একশো পয়সায় এক টাকা। অবশ্যই সেই-সেই দেশের মুদ্রায়। এতে হিসেব করতে সুবিধে হয়। একশো সেণ্টে এক ডলার। নব্বুই সেন্ট খরচ করলে পাতাল রেলের যে-কোনও দূরত্বে যাওয়া যায়। জীবনে প্রথমবার পাতাল-রেলে চাপল অর্জুন। আসনের পাশেই স্টেশনের নাম লেখা আছে। যে স্টেশন আসছে তার পাশে আলো জ্বলে উঠে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওরা চলে এল সোজা কুইন্সে। মানহাটান থেকেও পাতাল-রেলে চেপে এখানে আসা যেত, ম্যাপ দেখে বুঝতে পারল অর্জুন। মেজর কেন টাইম স্কোয়ার পর্যন্ত হাঁটালেন, তা প্রথমে ধরতে না পারলেও একটু-একটু অনুমান করছে। এই হাঁটার জন্যেই সম্ভবত মেজরের মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

মাটির ওপরে উঠে এসে মেজর বললেন, "সামনেই ম্যাকডোনাল্ড। যাও, গিয়ে খেয়ে এসো। ওহো, না, চলো, আমিও সঙ্গে যাই। তোমার নিরাপত্তাব প্রয়োজন।"

অর্জুন অনেক কষ্টে হাসি চাপল, "আপনি খাবেন না?"

"না। ইচ্ছে নেই। তুমি ভাবতে পারো অর্জুন, লোকটা

পরশুদিন টাইম স্কোয়ার থেকে কাচ কিনেছে তিরিশ সেন্টে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখেছে, সেই কাচ দিয়ে আলো বের হচ্ছে। পরদিনই জহুরিকে দেখিয়ে জেনেছে ওটা বিরল শ্রেণীর হিরে। জহুরি দাম দিতে চেয়েছিল আট হাজার ডলার। ও দেয়নি, কারণ হিরেটা ঘোরালে নাকি নানান রকমের আলো বের হচ্ছে। অথচ এসব আমায় জানায়নি।" করুণ মুখে বললেন মেজর।

"হয়তো জানাতেন। ব্যাপারটায় এত মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন ··"

"বলছ ?" মেজরকে অন্যমনস্ক দেখাল একটু, কিন্তু তারপরেই দু'প্লেট মুরগির মাংসভাজা, দুটো হ্যামবার্গার আর দুটো বড় সাইজের মিল্কশেক কিনে ম্যাকডোনাল্ডের গোল টেবিলে রেখে বললেন, "পেট পুরে খেয়ে নেওয়াই ভাল। হেনরিটা হাড়কিপ্টে। কফি ছাড়া কিছু খাওয়ায় না।"

ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানি সারা দেশে, দেশের বাইরেও শস্তায় ভাল খাবার পরিবেশন করার জন্যে ছিমছাম অথচ সুন্দর রেস্তোরাঁ তৈরি করেছে। কাউন্টারেব ওপাশে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সাদা অ্যাপ্রনে শরীর মুড়ে হাসিমুখে খাবার পরিবেশন করে। দেওয়ালে টাঙানো বোর্ডের মেনু দেখে অর্ডার দিয়ে নিজেই নিয়ে বসে যাও টেবিলে।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, ঝোড়ো বাতাস বইছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। এ তল্লাটে কেউ সচরাচর ফুটপাতে হাঁটে না। গাড়ির ভিড় লেগেই আছে। আরাম করে খেতে খেতে অর্জুন কাচের দেওয়াল দিয়ে কুইন্সের রাস্তা দেখছিল। মেজর চোখ বন্ধ করে খেয়ে যাচ্ছেন। বিশাল চেহারার এই মানুষটিকে শিশুর মতো দেখাচ্ছিল। অর্জুন দেখল, একটা গাড়ি এসে ম্যাকডোনাল্ডের পার্কিং লটে থামল। এখানে কত সুন্দর-সুন্দর গাড়ি দেখা যায়। দেশটা বড়লোকের কিন্তু অহঙ্কার দেখানোর বালাই বিশেষ নেই। সেদিন সে একটা কাণ্ড করেছিল। এবার আসবার সময় মেজর একটা পল্লীসংগীতের রেকর্ড কিনে এনেছিলেন। একদিন মেজর বাড়িতে ছিলেন না, সে

মনের সুখে জানলা খুলে গানটা জোর ভল্যুমে শুনছিল। পশ্চিম-বাংলার অনেক দূরে বসে বাংলা দেশের গ্রামের ছবি যখন মনের ক্যানভাসে আঁকা হচ্ছে, তখন বেল বেজেছিল। দরজা খুলতেই সে অবাক হয়ে দেখেছিল, একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে অফিসার জিজ্ঞেস করেছিল, "রেকর্ডটা কে বাজাচ্ছে?"

বাংলা গান এদেশে বাজানো অন্যায় কি না বুঝতে না পেরে সে বলেছিল, "আমি।"

"তা হলে আমার সাহায্য তোমাকে নিতে হয়!"

"সাহায্য?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে তোমার কানে কোনও গোলমাল হয়েছে। কাছেই হাসপাতাল আছে। চলো সেখানে।"

"আমার কানে তো কোনও গোলমাল নেই!" সে অবাক হয়েছিল আরও।

"সে কী! গোলমাল নেই, তবু অত জোরে গান বাজাচ্ছ? তুমি দেখছি পাড়াসুদ্ধ লোকের কান খারাপ করে ছাড়বে। কবে এসেছ এ-দেশে?"

অর্জুন দিনটা বলার পর অফিসার ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে বললেন, "তোমার পাশের ফ্ল্যাটে একজন হার্টের রুগি আছেন। যখনই গান বাজাবে, তাঁর কথা ভাববে। ভল্যুমটা কমিয়ে দিলে তো শুনতে অসুবিধে হয় না।"

অফিসার বলে চলে গেলে সে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। সে বইতে পড়েছে বিখ্যাত লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি টেনিদার জনক, পাড়ার ছেলেদের মাইকের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে লিখেছিলেন যে, তিনি আর বাঁচতে পারবেন না। আমাদের দেশে পুজোপার্বণে যখন মাইক চালানো হয়, তখন কোনও পুলিশ তো আসে না। মানুষই বা প্রতিবেশীর কথা কখন ভাবে?

অর্জুন দেখল লোক দুটো কথা বলতে-বলতে ম্যাকডোনাল্ডে ঢুকছে। তাদের মধ্যে একজন এদিকে তাকিয়েই খুব অবাক হল। দ্রুত পায়ে কাছে ছুটে এসে চিৎকার করে উঠল, "অ্যাই মেজর। তুমি, তুমি এখানে?"

২

মেজর চোখ খুলে একবার তাকালেন, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, "খাচ্ছি।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমাকে আমি ফোন করে করে হাল্লাক। কেউ ফোন ধরছেই না।"

"বাড়িতে কেউ না থাকলে ফোন বেজেই যায়।"

"আঃ। এভাবে কথা বলছ কেন? এই মেজর?"

"বন্ধু যখন বন্ধুর মতো আচরণ করে না তখন···তুমি কী ভেবেছ বলো তো, অ্যাঁ?" হঠাৎ মেজর চিৎকার করে উঠলেন।

ভদ্রলোকের মুখে এবার হাসি ফুটল। "এই তো! এতক্ষণে তুমি নর্মাল হয়েছে। মিট দিস জেন্টলম্যান। মিস্টার জর্জ রেগন। মেজর, আমার বন্ধু।"

লম্বা-চওড়া শরীরটা টেনে তুলে মেজর পেপার ন্যাপকিনে আঙুল মুছে হাত বাড়ালেন, "আমি আশা করব আপনি এ-দেশের প্রেসিডেন্টের কোনও আত্মীয় নন?"

"না, না।" ভদ্রলোক, বেঁটেখাটো, সুন্দর চেহারার, লজ্জিত হলেন, "আমি সোনা-রুপো মণি-মুক্তোর ব্যবসা করি মাত্র।" তাঁর ডান হাতে একটি লাল পাথরের আংটি চমৎকার দেখাচ্ছিল।

মেজর এবার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন, "যে হতচ্ছাড়াটার জন্যে অ্যাদ্দুর এলাম এ হল সেই, হেনরি ডিমক। হেনরি, হি ইজ অর্জুন।"

হেনরি ডিমক মাথা দুলিয়ে হাত বাড়ালেন। বোঝা গেল, মেজর ইচ্ছে করেই অর্জুনের পরিচয় বিশদে জানালেন না। অবশ্য পরিচয় বলতে তো ওই একটাই, যা লাইটারকেন্দ্রিক। কিন্তু এত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে মেজর এতদিন তার কথা বলেননি কেন? অর্জুনের মনে হল, হয়তো মেজর হেনরি ডিমককে বলেছিলেন, কিন্তু সেটা

তাঁর মনে আছে কি না যাচাই করার জন্যে শুধু নামটা বলেই চেপে গেলেন। রেগন-সাহেব ততক্ষণে কাউণ্টারে চলে গেছেন। কাগজের গ্লাসে হু'কাপ কফি নিয়ে ফেরত এলেন ভদ্রলোক। একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না অর্জুনরা কফি খাবে কি না। হয়তো হাতে মিল্কশেকের গ্লাস দেখেই তা করেননি। চিনি, নুন এবং ঝালমশলা আলাদা-আলাদা ছোট প্যাকেটে স্তূপ করে রাখা আছে। প্রয়োজন-মতো নিয়ে নাও। দেখা গেল, রেগন-সাহেব চিনি বেশি খান, ডিমক আদৌ খান না। ডিমক কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "মিস্টার রেগন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। টেলিফোনে তোমাকে যে হিরেটার কথা বলেছিলাম, সেটা উনি কিনতে চান। এখন দশ হাজার পর্যন্ত উঠতে রাজি আছেন।"

"দশ হাজার ডলারের হিরে কেউ তিরিশ সেণ্টে বিক্রি করে না। ওটা স্রেফ কাচ।" মেজর মন্তব্য করতেই রেগন-সাহেব কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন, "আমি আমার প্রফেশনটা বুঝি। কোন্ হকার ওঁকে বিক্রি করেছে, কীভাবে তাঁর হাতে এল ও-জিনিস, তা আমি জানি না। কিন্তু ওর একটা পেয়ার আছে লস অ্যাঞ্জেলিসে। দিনের বেলায় ঠিক কাচ বলে মনে হলেও, রাত্রে বিচিত্র আলো বের হয়।"

হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, "লস অ্যাঞ্জেলিসের কোথায়?"

"স্যান ডিয়াগোর সি-ওয়ার্ল্ডে। জলের মধ্যে দিয়ে ওই হিরের আলো প্রবাহিত হয়। গভর্নমেণ্ট স্পেশ্যাল সিকিউরিটি রেখেছে হিরেটার জন্যে।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "প্রথম কথা, হুটো জিনিস এক কি না, তাতেই আমার সন্দেহ হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা, আপনি এত ইণ্টারেস্টেড কেন?"

"কারণ আমি এসব জিনিসের ব্যবসাদার। সিদ্ধান্তটা তাড়াতাড়ি নিন, মিস্টার ডিমক।

খবরটা চাউর হতে বেশি দেরি হবে না। আর জানেনই তো,

যত মানুষ জানবে, তত সমস্যা বাড়বে।" রেগন সাহেব বললেন।

কিন্তু মিস্টার ডিমক কোনও স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন না। তিনি আরও দু'দিন ভাববার সময় নিলেন। ব্যাপারটা পছন্দ হল না রেগন সাহেবের। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা বুঝিয়ে বলে চলে যাওয়ার পর ওরা হেনরি ডিমকের বাড়িতে এল।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল অর্জুনের। ঠাণ্ডা জোর-বাতাসে চুল উড়ছিল। রঙিন বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে ওরা পৌঁছল মিস্টার ডিমকের বাড়িতে। এদিকে দোকানপাট নেই। ছাড়া-ছাড়া একতলা ছবির মতো বাড়ি। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে মিস্টার ডিমক ওদের ভেতরে আসতে বললেন। ম্যাকডোনাল্ড থেকে বেরিয়ে পুরো রাস্তাটা হেঁটে আসার সময় সারাক্ষণ তিনি মেজরের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। অর্জুন ছিল খানিকটা পিছিয়ে। ঘরে ঢুকে দেখল, দেওয়ালময় যে-সব জিনিস টাঙানো তাতে মানুষটির শখ অথবা জীবিকার কথা বোঝা যায়। বিভিন্ন অভিযানের নানান স্মারক ওগুলো। ওদের বসবার ঘরে বস'ব বলে কয়েক পা এগিয়ে মিস্টার ডিমক চিৎকার করে উঠলেন, "মাই গড!"

মেজর আরাম করে বসতে যাচ্ছিলেন, না বসে বললেন, "কী হল?"

"কেউ এসেছিল। এপাশের দরজাটা ভেজানো। অথচ গত এক সপ্তাহ ধরে ওটা বন্ধ ছিল।"

হেনরি ডিমক প্রায় ছুটে গিয়ে দরজায় চাপ দিতে সেটা খুলে গেল। ওপাশটায় বারান্দা এবং এক চিলতে ঘেরা-বাগান। বাগানের পাঁচিলটা বড়জোর পাঁচ ফুট উঁচু।

তীরের মতো হেনরি ডিমক পাশের ঘরে ঢুকলেন, "অফ কোর্স কেউ এসেছিল। মাই গড। আমি তো মাত্র মিনিট পঁয়তাল্লিশেক বাড়ির বাইরে ছিলাম।"

ঘরের সমস্ত জিনিস ওলট-পালট করেছে কেউ। দু'দুটো

আলমারির পাল্লা ভাঙা। তার সব জিনিস ঘরের মধ্যে ডাঁই করে রাখা। মেজর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বউ কখন বেরিয়েছে হেনরি ?"

"সে তো ব্রেকফাস্ট খেয়েই অফিসে চলে গিয়েছে। কিন্তু কী নিতে এসেছিল লোকটা ?" বলতে বলতে হেনরি ছুটল পাশের দরজা দিয়ে। অর্জুন অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলার ঘরে নেমে এল। ঘরটা বিশাল। হয়তো এ-পাড়ায় দোতলা করার নিয়ম নেই বলেই মাটির তলায় এই ঘর করা হয়েছে। পুরোটা কার্পেট এবং ওয়ালপেপারে মোড়া। টিভি, পড়ার টেবিল, বইয়ের আলমারি থেকে ডিভান পর্যন্ত রয়েছে। ওপাশে একটা মিনি টয়লেট।

এখানেও আগন্তুক পা রেখেছিল। হেনরি ডিমক টেবিল থেকে কাঁপা হাতে একটা কালিব দোয়াত তুলে নিলেন। একটু নাড়ালেন কানের কাছে এনে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আর একটা পাত্রে দোয়াতটা উপুড় করতেই নীল কালি পড়তে লাগল। তারপর চিমটে দিয়ে তিনি বস্তুটিকে বের করতেই মেজরের গলা পাওয়া গেল, "বলিহারি বুদ্ধি! কাচটাকে দোয়াতে রেখেছ ?"

"কাচ নয়, হিরে রেগনকে দেখানোব পর মনে হয়েছিল কালির ভেতর রাখলে আলো বের হয় কি না এসে দেখব। রেখেছিলাম বলেই বেঁচে গেল।"

মেজর ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, "চোর এই বস্তুর জন্যে এসেছিল এটা মনে করার কী যুক্তি আছে। তুমি যে ফুটপাত থেকে কাচটা কিনেছ…"

"কাচ নয়, হিরে!" হেনরি বাধা দিলেন।

"ওই হল। যে ফুটপাত থেকে কিনেছ, তা এই কুইন্স থেকে অনেক দূরে। অতএব কারও জানার কথা নয় জিনিসটা তোমার কাছে এসেছে। জহুরি এবং আমাকে ছাড়া কাউকে বলেছ ?"

মেজরের প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে না বললেন হেনরি। মেজর

বললেন, "তা হলেই বুঝতে পারছ, যখন কেউ জানেই না যে, ওটা তোমার কাছে আছে, তখন খামোখা নিতে আসবে কেন? চোর এসেছিল নিশ্চই অন্য ধান্দায়। এই নাও।" বলে একটা খাম পকেট থেকে বের করে উঁচিয়ে ধরলেন মেজর।

"কী ওটা?" হেনরির চোখ ছোট হয়ে এল।

"রেয়ার টাইপ অব পপি। কালিম্পঙের পাহাড়ে দেখতে পেয়ে তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।"

কাচটা অথবা সত্যিকারের হিরেটাকে টেবিলের ওপর রেখে হেনরি যেভাবে খামটা নিলেন অর্জুন তাতে অবাক হয়ে গেল। মহার্ঘ কোনও বস্তু পাচ্ছেন এইরকম ভঙ্গিতে তিনি খামটা খুলতে লাগলেন। অর্জুনের মনে পড়ল, কালিম্পঙের বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে সে মেজরকে প্রথম দেখেছিল পপি খুঁজতে। এখন দুই প্রৌঢ় যেভাবে তন্ময় হয়ে পপির গুণাগুণ নিয়ে কথা বলছেন, তাতে কে বলবে একটু আগেই ওঁরা হিরের ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন।

অর্জুন টেবিলে রাখা হিরেটার কাছে চোখ নিয়ে গেল। এখনও কালির সামান্য দাগ রয়ে গেছে ওর শরীরে, কিন্তু আলো-কালো তো কিছু বের হচ্ছে না। সে আঙুলের ডগায় বস্তুটিকে ধরল। সাধারণ কাচের মতো। রাস্তায় পড়ে থাকলে সে নিজেও এটাকে গুরুত্ব দিত না। অথচ এর দাম এখন উঠেছে দশ হাজার ডলার। ভাবা যায়?

মেজর ব্যাপারটা লক্ষ করে এগিয়ে এলেন, "কী ভাবছ মিস্টার ডিটেকটিভ?"

হেনরি অবাক হলেন, "ডিটেকটিভ?"

মেজর বললেন, "তোমার স্মৃতি খুব খারাপ টাইপের। তোমাকে সেদিন বললাম না, ভারত থেকে যে তরুণ ছেলেটি এদেশে এসে জোন্স অ্যাণ্ড জোন্সের লাইটার খুঁজে বের করেছে, সে আমার কাছেই উঠেছে? এই সেই ছেলে।"

হঠাৎ যেন এতক্ষণ বাদে হেনরি ডিমক তাকে নজর করলেন। উচ্ছ্বসিত হাসি নিয়ে হাত বাড়ালেন হেনরি ডিমক, "ওহ, ইউ আর দ্যাট ডিটেকটিভ! তোমার বয়স এত কম আমি ভাবতে পারিনি। তোমার কি মনে হয় লোকটা ওই হিরের জন্যে এসেছিল?"

অর্জুন বলল, "আমরা এখনও জানি না, একজন না অনেকে। তা ছাড়া জহুরি ভদ্রলোক যদি কাউকে গল্প করে থাকেন যে, ওটা আপনার কাছে আছে, তা হলেই···আপনি একবার জহুরিকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

হেনরি বললেন, "দ্যাট'স্ এ গুড আইডিয়া। পুলিশকেও বলতেই হবে। আমার বাড়িতে অজানা লোক এভাবে ঢুকুক আমি পছন্দ করি না।"

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা মতলব ঢুকল। কেন ঢুকল সে জানে না। হেনরি যখন রিসিভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন সে বলল; "রেগন সাহেবকে বলুন, মেজর হিরেটা কিনতে চাইছেন। উনি আপনাকে পনেরো হাজার ডলার দাম দিচ্ছেন।"

"আমি?" মেজর আঁতকে উঠলেন, "নো! নেভার! পনেরো ডলার পর্যন্ত নয়। ওসব মণিমুক্তো থেকে আমি দশ মাইল দূরে থাকতে চাই।"

হেনরি যখন কথা বলছিলেন, তখন অর্জুন ঘুরে-ঘুরে ঘরটাকে দেখছিল। পুলিশ কি এখানে আগন্তুকের হাতের ছাপ পাবে? এতটা কাঁচা এদেশের মানুষ হবে বলে মনে হয় না। সে এমন কিছু পাচ্ছিল না যা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। হেনরি টেলিফোন নামিয়ে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে তাকালেন, "এ কী কথা! রেগন এখন বিশ হাজার বলছে। লস অ্যাঞ্জেলিসে যেটা আছে, তার দামও নাকি তাই। সাত বছর আগে একটা হাওর পাগল হয়ে কাচ ভেঙে ফেলবার পর এই হিরেটা নাকি খোয়া গিয়েছিল। তিনটে মার্ডার হয়েছে হিরেটাকে কেন্দ্র করে। শেষ মৃত মানুষটি পৃথিবীতে ছিল আড়াই বছর আগে। তারপর হিরেটার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

মেজর বললেন, "কিন্তু রেগন কি কাউকে বলেছে যে, হিরেটা তোমার কাছে আছে?"

হেনরি ডিমক মাথা নাড়লেন, বললেন, "বোকারাই এ নিয়ে আলোচনা করে। বাট আই ডোণ্ট বিলিভ। চোর অন্তর্যামী নয়। কিন্তু আমার এসব ভাল লাগছে না, মেজর। বিশ হাজারে দিয়েই দিই। টাকাটা সামনের বছর আমাদের ইয়েতির অনুসন্ধানে কাজে লাগবে।"

অর্জুন ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে এল। চোর দ্বিতীয় ঘর এবং নীচের ঘরটাই তছনছ করেছে, কিন্তু ওপাশের বন্ধ ঘরটায় ঢোকেনি। দরজাটা ভাঙারও চেষ্টা করেনি। কেন? সময় কম ছিল বলে? তা হলে ওরা এ-বাড়িতে ঢোকার কাছাকাছি সময়ে চোর পালিয়েছে। বন্ধ ঘরটায় কে থাকে? অর্জুন ওপরের বিধ্বস্ত ঘরটায় কিছু খুঁজে পেল না। তারপর পাশের দরজাটা খুলে বারান্দায় এল। সরু লম্বা বারান্দা। সবুজ ঘাসের লন গা ঘেঁষে। তারপরেই ফুলের গাছ। অর্জুন ঝুঁকে দেখতে লাগল। ঘাসের ওপর পায়ের চাপ পড়েছে। দরজাটা যদি সাতদিন বন্ধ থাকে, তা হলে হেনরি এদিকে আসেননি। চাপটা চোরের শরীরের। ঘাস যেখানে হয়েছে, সেখানে নরম মাটির ওপর জুতোর দাগ। অর্জুন লক্ষ করল, জুতোর হিলে অর্ধ-গোলাকৃতি কিছু বসানো ছিল বলে সেটা মাটিতে ঢুকেছে পা ফেলার সময়। অল্প মাটি উঠে গেছে তাই জুতোর তলায়। দাগটা অনুসরণ করে সে পাঁচিলটা পর্যন্ত গেল। তারপর লাফিয়ে পাঁচিলে উঠে বসল। ওপাশে ঢালু মাঠ, পপলার গাছ, ছবির মতো সুন্দর রাস্তা। কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। সে শরীর ঝুলিয়ে এপাশে নেমে এল। মাটি শক্ত, জুতোর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সোজা এগিয়ে এসে রাস্তায় পড়তেই ও পার্কিং লটটা দেখতে পেল। এখানে গাড়ি রেখে স্বচ্ছন্দে ওপরে ওঠা যায়। অর্জুন চারপাশে তাকাল। পার্কিং লটের পাশেই টেলিফোন-বুথের মতো একটা ঘর। ওপর থেকে গাছপালার আড়াল থাকায় এটাকে চোখে

পড়েনি। অর্জুন একটু এগিয়ে যেতেই গলা ভেসে এল, "ইয়েস সার! হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?"

বুথের ভেতর টুলে বসা একটি বৃদ্ধ হাসিমুখে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন। অর্জুন মাথা নাড়ল, "আমি এক ভদ্রলোককে খুঁজছি, যিনি এখানে গাড়ি রেখেছিলেন একটু আগে।"

"ভদ্রলোক?" বৃদ্ধ খিচিয়ে উঠলেন, "ওকে ভদ্রলোক বোলো না। পনেরো সেণ্ট কম দিয়ে গেছে। পার্কিং ফি দিতে যাদের গায়ে লাগে, তারা গাড়ি রাখে কেন?"

"কীরকম দেখতে বলুন তো ওকে?"

"ওইতো লম্বা, ভারী চেহারা, একটা পা সামান্য টেনে হাঁটছিল। আরে, লাল টয়োটা গাড়ি, দু'চক্ষে দেখতে পারি না।" বৃদ্ধ বিড়বিড় করছিলেন।

"গাড়িটার নাম্বার মনে আছে?"

"না। খাতায় লেখা আছে। কিন্তু আপনাকে বলব কেন?"

অর্জুনের হঠাৎ খেয়াল হল কার্ডটার কথা, যেখানে লেখা আছে, তাকে সাহায্য করা মানে সরকারকে সাহায্য করা হবে। সেটা দেখাতেই বৃদ্ধের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। তিনি খাতা দেখে নম্বর বললেন, "এটা বিনসেক কোম্পানির গাড়ি। ওরা গাড়ি ভাড়া দেয়।"

সামান্য ঘুরে হেনরি ডিমকের বাড়িতে যখন ফিরে এল অর্জুন, তখন মেজর খুব চিন্তিত। দেখামাত্র চিৎকার করে উঠলেন, "কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"একটু পায়চারি করে এলাম। মিস্টার ডিমক, রিনসেক বলে কোনও কোম্পানি আছে যারা গাড়ি ভাড়া দেয়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"থাকতে পারে। কেন?"

অর্জুন ব্যাপারটা বলল। হেনরি ডিমক গাইড দেখে নম্বর বের করে বোতাম টিপলেন টেলিফোনের। রিনসেক জানাল, ওই

নাম্বারের গাড়িটা তিনদিন হল এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছিলেন। একটু আগে তিনি ফেরত দিয়ে গেছেন ভাড়া মিটিয়ে।

অর্জুন বলল, "ব্যাপারটা সুবিধের নয়, মিস্টার ডিমক। আপনি পুলিশকে জানান।"

হেনরি বললেন, "জানাব। কিন্তু আমার খুব লোভ হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলিসেব হাঙরের বাক্সে অন্য যে হিরেটা আছে, সেটাকে দেখতে। আমারটা যদি ওটার জোড়া হয়, তা হলে সমান্তরালভাবে দুটোকে রাখলে যে আলো বের হবে, সেই আলো জলের মধ্যে মিলিত হলে নাকি কোনও হাঙর তা অতিক্রম করতে পারে না। বেগন বলছিল এটা। পুলিশকে জানালে হিরেটার কথাও বলতে হবে। বললে ওরা জাতীয় সম্পত্তি বলে এখনই নিয়ে নেবে। লস অ্যাঞ্জেলিসের ব্যাপারটা দেখাব পর এটা পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

"কিন্তু হিরেটা আপনার কাছে রাখা বিপজ্জনক।"

"আমার কাছে নেই।"

"নেই মানে?" অর্জুন হতভম্ব হতেই মেজব হাতের ছড়িটা নাচালেন। এখানে আসার সময় মেজরের হাতে ছড়ি ছিল না। কাজ-করা দামি ছড়িটা তিনি হেনরি ডিমকের কাছ থেকেই পেয়েছেন। অর্জুন বলল, "ওতে ঠিক থাকবে তো?"

মেজর হাসলেন, "লুকনো গর্ত। আট প্যাঁচ না খুললে পড়ার চান্স নেই।"

৩

কেনেডি এয়ারপোর্টটা এত বড় যে, সামলে ওঠা মুশকিল। যেসব এয়ারলাইনস্ দেশের মধ্যে চলাচল করে, তাদের মধ্যে আমেরিকান এয়ারলাইনসের সুনাম বেশি। টিকিটের দাম ট্রেনের টিকিটের চেয়ে কম অবশ্য পিপলস্ এয়ারওয়েজে। জনতা এক্সপ্রেস আর কি! ওতে টিকিট নিতে হয় আকাশে ওড়ার পর কনডাক্টরের হাতে ডলার দিয়ে। শস্তা বলেই বিনি পয়সায় কিছুই খেতে দেয় না। মেজর এবং হেনরি ডিমক অবশ্য আমেরিকান এয়ারলাইনসেই যাচ্ছেন। ‘লাইটার’-এর কল্যাণে অর্জুনের টিকিটের অসুবিধে হয়নি।

এর মধ্যে একদিন হেনরি ডিমকের বাড়িতে হামলা হয়েছে। সেটা হয়েছে, যখন তিনি বা তাঁর স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। টেলিফোন এসেছিল হুমকি দিয়ে যে, যদি তিনি হিরেটা কাউকে বিক্রি করেন, তা হলে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হবে। হেনরি ডিমক অম্লান বদনে বলেছেন, হিরেটা তাঁর কাছে নেই।

সেদিন ডিমকসাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেজরকে নিয়ে অর্জুন গিয়েছিল রিনসেক কোম্পানিতে। যে-লোকটা ডিউটিতে ছিল, সে কার্ডটা দেখার পর মাটির তলায় গ্যারাজে ওদের নিয়ে গিয়েছিল। শ'খানেক গাড়ির মধ্যে সেই নাম্বারের গাড়িটা বের করে দেখিয়েছিল ওদের। দামি এয়ারকণ্ডিশণ্ড গাড়ি। কোথাও কোনও চিহ্ন ফেলে যায়নি লোকটা। কিন্তু ড্রাইভিং সিটের পা'দানিতে অর্জুন এক টুকরো মাটি দেখতে পেয়েছিল। লোকটার সম্পর্কে মেজর খোঁজখবর নিতে কর্মচারীটি বিশদ বলতে পারল না। শুধু জানিয়েছিল, ওই গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে, টেলিফোনে।

কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনটা উড়েছিল দুপুরে। টানা পাঁচ ঘণ্টা ওড়ার পর লস এঞ্জেলিসে থামবে। মেজর এবং হেনরি ডিমক

পাশাপাশি বসেছেন। মেজর খুব উত্তেজিত। না হলে ছড়িটাকে ওইভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেতন না। সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় বেশ মজার ব্যাপার ঘটেছিল। মেজর যখনই ছড়ি হাতে মেটাল ডিটেক্টারের মধ্যে দিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন, তখনই টুংটাং শব্দ বাজছিল। সিকিউরিটির লোকজন ওঁকে ছড়ি ছাড়া হাঁটতে বলায় মেজর অভিনয় করলেন যেন তিনি সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না। ছড়িটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তলায় লোহার নালটাকে আবিষ্কার করে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, লোহার জন্যেই শব্দটা হচ্ছে। পরে একা হলে মেজর বলেছিলেন, “অ্যাকটিং করলে, বুঝলে, অ্যালেক গিনেসকে হার মানিয়ে দিতাম।” বলার সময় যদিও গলা কাঁপছিল।

পাশাপাশি বসে মেজর এবং হেনরি খুব গল্পে মশগুল। অর্জুন বসেছে কিছুটা পিছিয়ে। সুন্দরী এয়ারহোস্টেসরা হাসিমুখে খাবার সার্ভ করছে। অর্জুন তার সামনের খাপ থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল। আমেরিকান এয়ারলাইনসের নিজস্ব পত্রিকা। রঙিন বিজ্ঞাপন দেখতে মন্দ লাগে না। ওর পাশে যে ছেলেটি বসে আছে, সে বেশ স্বাস্থ্যবান। বসা অবধি উসখুস করছে। একসময় সে উঠে টয়লেটের দিকে চলে গেল। অর্জুন নিজের আসন ছেড়ে মেজরের সঙ্গে দু’চারটে কথা বলে এসে দেখল এয়ারহোস্টেস তাদের সিটের সামনের ট্রে টেনে খাবার দিয়ে গেছে। ছেলেটি টয়লেট থেকে ফিরে এসে নিজের খাবার গপগপিয়ে খাচ্ছে। খিদে ছিল না। একটা প্যাস্ট্রি তুলে—অর্জুন নিজের প্লেট থেকে হাত গোটাবার আগেই ছেলেটা বলেছিল “মে আই হেল্প ইউ?” যেন অর্জুনের খাবার শেষ করার দায়টা ও নিতে চাইছে। মজা লেগেছিল, প্লেটটা এগিয়ে দিয়েছিল অর্জুন। সেটাও সাবাড় করে ছেলেটা চোখ বন্ধ করেছিল, কিন্তু শান্ত হয়নি। সাহেবরা যে কারও এঁটো খাবার চেয়ে খেতে পারে, তা আগে কেউ বললে অর্জুনের বিশ্বাস হত না। এখন ম্যাগাজিন দেখতে-দেখতে সে ছেলেটির

অস্বস্তি আর একবার লক্ষ্য করল। হেসে বলল, "কী ব্যাপার, তোমার কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

"কে বলেছে অসুবিধে হচ্ছে? আমি তোমাকে বলতে গিয়েছি?" ছেলেটা রাগী গলায় বলল।

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। যারা ভাল ব্যবহারের এমন জবাব দেয়, তাদের এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। প্লেন উড়ছে অন্তত ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে। • চারধারে পরিষ্কার আকাশ। নীচে মেঘের মাঠ। এই প্লেন সোজা উড়ে গিয়ে থামবে লস অ্যাঞ্জেলিসে যে শহরে আছে হলিউড। সঙ্গে-সঙ্গে চার্লি চ্যাপলিন, লরেল হার্ডি থেকে হিচককের মুখ মনে পড়তেই সে সোজা হয়ে বসল। মেজরকে বলতে হবে হলিউড ঘুরে দেখাবার কথা।

পাশের ছেলেটি উঠে গিয়েছে টয়লেটে। অনেকক্ষণ। এয়ারহোস্টেসরা জানলা বন্ধ করতে বলল যাত্রীদের। তারপর ভিডিওতে ছবি শুরু হল। জেমস বণ্ডের 'ডক্টর নো'। ছবি চলছে। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে প্লেনটা কেঁপে উঠল। চমকে সমস্ত যাত্রী উঠে দাঁড়িয়েছে। পেছন দিকে খুব ব্যস্ততা, উঁচু গলায় উত্তেজিত সংলাপ। ছবি বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল, "ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা যে যার আসনে বসে থাকুন। প্লেনের মাঝখানের টয়লেট আপাতত বন্ধ থাকছে। আমরা আপনাদের সাহায্য চাইছি।"

একজন এয়ারহোস্টেস ছুটে আসছিলেন, পেছনের সিটের দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাবে জানিয়ে গেলেন, টয়লেটে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। কথাটা কানে যাওয়ামাত্র যাত্রীরা যে-যার আসনে বসে পড়ল। অর্জুনের শরীরে হিম-ছোঁয়া লাগল। ছেলেটা এখনও আসছে না। তা হলে কি···। সে উঠে এগিয়ে যেতেই একজন বিমান-কর্মচারী বলল, "ওদিকে যাবেন না। আপনার পাশের ছেলেটা ওখানে মারা গিয়েছে।"

অর্জুন যেন অসাড় হয়ে গেল। সে কোনওমতে মুখ ফেরাতে

দেখল পেছনের সিটের দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ালেন।

লস অ্যাঞ্জেলিস এয়ারপোর্টে ওদের তিন ঘণ্টা আটকে থাকতে হল। প্লেনের সমস্ত যাত্রীকেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। যেহেতু ছেলেটির আসন ছিল অর্জুনের পাশে, তাই তাকে একটু বেশি। একটা ছেলে নিজেরটা অন্যেরটা খেয়ে টয়লেটে গিয়ে আত্মহত্যা করবে, এটা ভাবতেও অবাক লাগছিল অর্জুনের। অথচ মৃতদেহে হত্যার কোনও চিহ্ন নেই।

যে অফিসার অর্জুনকে ডেকে নিয়ে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তাঁর সামনে যে ব্যাগটা পড়ে রয়েছে, সেটা মৃত ছেলেটির। ওটাকে মাথার ওপরের লাগেজ র‍্যাকে রাখতে সে দেখেছিল ছেলেটিকে। অফিসার বললেন, "আপনি বলছেন মৃত মানুষটি আপনার কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেয়েছিল। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

অর্জুন হাসল, "আমি মিথ্যে বলি না।" তারপর সে পকেট থেকে কার্ডটা দেখাল।

কার্ড দেখে সামান্য ভাবান্তর হল অফিসারের। তিনি বললেন, "সরকারি অতিথিরা যে সম্মান পান, আপনি তাই পাচ্ছেন। কিন্তু··· আপনি এর আগে লস অ্যাঞ্জেলিস এসেছেন?"

"আমি এই প্রথম আমেরিকায় এসেছি। পাসপোর্ট দেখুন।"

"মুশকিল কি জানেন, একবার আমেরিকায় এসে বার কয়েক নিউইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলিস ঘুরে যাওয়া যায়। ঠিক আছে, আমরা সবাইকে যা বলছি আপনিও তা-ই করুন। আপনার ঠিকানা রেখে যান, দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারি।"

অর্জুন মেজরের ঠিকানা লিখে দিল। তারপর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওর ব্যাগে কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি?"

"না। শুধু রিনসেক কোম্পানির কার হায়ারের রসিদ ছাড়া।"

"রিনসেক কোম্পানি?" অর্জুন চমকে উঠল।

“কী ব্যাপার বলুন তো?”

“উনি কবে রিনসেক কোম্পানিতে গাড়ি ভাড়া করেছিলেন?”

অফিসার হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়ে রসিদ বের করে তারিখটা বললেন। চোখ বন্ধ করে অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর বলল, “অফিসার, আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু ওর মৃতদেহ কোথায়?”

“এয়ারপোর্টের মর্গে আছে এখনও।”

“আমি দেখতে পারি একবার?”

“কেন?”

“আমি আপনাকে বলব, কিন্তু তার আগে আমি দেখতে চাই।”

অফিসার আর-একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাবার নির্দেশ দিয়ে অর্জুনকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হলেন। পুরো বাড়িটাই নিশ্চয়ই এয়ারকণ্ডিশণ্ড। কারণ নামার সময় প্লেনে শহরের টেম্পারেচার যা বলেছিল, অগস্ট মাসে জলপাইগুড়িতে তা-ই থাকে। অথচ তার এক ফোঁটাও গরম লাগছে না। অনেকটা যাওয়ার পর ওরা যে-ঘরে ঢুকল, সেখানে একটা লম্বা ট্রে-র ওপরে ছেলেটি শুয়ে আছে। ধীরে ধীরে অর্জুন ওর সামনে দাঁড়াল। একটা চোখ বন্ধ, একটা চোখ আধ খোলা। কিছুক্ষণ আগেও ও তার খাবার চেয়ে খেয়েছিল। মুখে কোনও বিকৃতি নেই। পোস্টমর্টেম না করলে মৃত্যুর কারণ বোঝা যাবে না। অর্জুন ওর পায়ের দিকে চলে এল। তারপর নিচু হয়ে জুতোর হিলটা লক্ষ্য করে উত্তেজিত হয়ে উঠল। মৃত মানুষটার জুতোর তলায় অর্ধগোলাকৃতি লোহা বসানো। এবং লম্বা খাঁজে মাটি চাপ হয়ে বসে আছে। দুটো পায়ের জুতোতেই এক ব্যাপার।

অর্জুন বুঝল অফিসার তার দিকে তাকিয়ে আছেন। লস অ্যাঞ্জেলিস টেলিফোনে নিউইয়র্কের রিনসেক কোম্পানি থেকে গাড়ি ভাড়া করে হেনরি ভিমকের বাড়িতে যে হানা দিয়েছিল সে এই ব্যক্তি, তা প্রমাণ করতে ওর জুতো নিয়ে যেতে হয় হেনরি

ডিমকের বাগানে। সেখানে জুতোর ছাপ এখনও আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু জুতোর ভেতর ঢুকে থাকা মাটি আর বাগানের মাটি যে এক, তা প্রমাণিত হবে। কিন্তু যদি না হয়, এই ছেলেটি যদি অন্য কারণে গাড়ি ব্যবহার করে থাকে, অন্য জায়গার মাটি ওর জুতোয় লেগে যায়, তা হলে? আর এবার সেই সত্যিটা বলতে হয় অফিসারকে। হেনরি ডিমকের কেনা কাচ কী করে হিরে হয়ে গিয়েছে, কী উদ্দেশ্যে ওরা লস অ্যাঞ্জেলিসে এসেছে, এবং, সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, হিরেটা ওরা লাঠিতে ভরে নিয়ে এসেছে।

জুতোর শব্দ করে অফিসার এগিয়ে এলেন, "ব্যাপারটা কী?"

"এই লোকটি বিনসেক কোম্পানি থেকে গাড়ি ভাড়া করে কুইন্সের একটা পার্কিং লটে ঝামেলা করেছিল পার্কিং ফি দেওয়া নিয়ে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

"সেটা আপনি মুখ দেখে বলতে পারলেন না, জুতোর তলা দেখে বলতে হল?"

"কারণ মুখটা মনে ছিল না। ওর পায়ের জুতোর হিলে লোহাটা সেদিন খুব শব্দ করছিল। এইটুকু স্মরণে আছে।"

"কুইন্সের কোন্ পার্কিং লটে?"

অর্জুন হেনরি ডিমকের বাড়ির পেছনের এলাকাটা বুঝিয়ে দিল। ওরা অফিসে ফিরে এলে অফিসার ইতিমধ্যে-আসা একটা কাগজ টেবিল থেকে তুলে নিলেন। সেটা পড়ে চাপা গলায় বললেন, "দিস ম্যান ওয়জ এ প্রফেশনাল থিফ। এর আগে তিনবার জেল খেটেছে। একটা চোরের মৃত্যু হলে আমাকে বেশি চিন্তা করতে হবে না।"

পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা যখন ট্যাক্সিতে চেপে শহরে ঢুকছিল, তখন অর্জুনের মাথায় নানান চিন্তা ধাক্কা খেয়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত সে হেনরিসাহেবকে বলেনি যে, তাঁর বাড়িতে যে চোর ঢুকেছিল, সে-ই মারা গেছে। ও যদি প্রফেশনাল চোর হয়, তা হলে কেউ কি তাকে ভাড়া করে নিউইয়র্কে

পাঠিয়েছিল? যদি তা-ই হয়, তা হলে প্লেনে কি কেউ ওকে খুন করেছে? খুন করলে তো তার চিহ্ন থাকবে শরীরে। আত্মহত্যা করলেও। এরকম ভদ্রলোকের মতো কেউ মরে যেতে পারে?

সে বিষয়টা নিয়ে এমন মগ্ন ছিল যে, শহরটাকে ভাল করে দেখছিল না। মেজরের কথায় তার খেয়াল হল। "তুমি লস অ্যাঞ্জেলিসে নামা মাত্র একটা খুন হয়ে গেল হে।"

"নামার আগেই। কিন্তু মেজর, আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।"

"সাবধানে! আমি কখনও ভয় পাই না। হেনরি, তুমি কি ভয় পাও?"

হেনরি নীরবে মাথা নাড়লেন। অর্জুন কিছু বলল না। মেজর দু'হাতে লাঠিটাকে আঁকড়ে ধরে আছেন। যাঁরা লাঠি ব্যবহার করেন, তাঁরা কখনওই ওই ভঙ্গিতে লাঠি ধরেন না।

সেই একই দৃশ্য। বিরাট চওড়া রাস্তা, ফুটপাতে মানুষ নেই, অথচ মিনিটে হয়তো একশোটা গাড়ি ছুটছে। যেতে-যেতে দুটো মোটেল দেখল অর্জুন। মোটরে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্যে থাকার ব্যবস্থা মোটেলে। মোটর ছাড়া মানুষ ওখানে থাকতে পারে কি না কে জানে। সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলায় জলপাইগুড়িতে মোটর কথাটা খুব চালু ছিল। এখন সচরাচর কেউ বলে না। কিন্তু মোটেল শব্দটাকে তো বেশ রোমান্টিক লাগছে।

ওরা যে হোটেলে উঠল, তার নাম এঞ্জেলেস। সুন্দর ঝকঝকে হোটেল। আটতলা। প্রতিটি ডাবল-বেড ঘরের জন্যে নেবে পঞ্চাশ ডলার। মেজর এবং হেনরি একটি ঘর নিলেন। অর্জুনকে সিঙ্গল বেড দেওয়া হল, যার দাম তিরিশ ডলার। এখন আর সে টাকার হিসাবে ডলারকে ছাখে না, ওতে খুব কষ্ট হয়। এই এত টাকা নিচ্ছে, কিন্তু শোওয়ার জায়গা ছাড়া এক কাপ চা পর্যন্ত বিনি পয়সায় দিচ্ছে না।

নিজের ঘরে ঢুকে অর্জুন নরম শাদা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। মেজর বলছেন ঠিক আটটায় তৈরি থাকতে, ডিনার খেতে বের হবেন। দীর্ঘ বিমানযাত্রা, মৃত্যু নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, অর্জুনকে কাহিল করেছিল। সে চুপচাপ শুয়ে ব্যাপারটা ভাবছিল। হেনরি ডিমকের হিরের প্রতি কোনও লোভ নেই। তিনি ওটা পুলিশের হাতে স্বচ্ছন্দে তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু জোড়া হিরের আলো দেখার লোভে একটা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন। হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের মাথায় পা রাখা অথবা উত্তরমেরুর শেষ বিন্দুতে পৌঁছে যাওয়ার লোভে মানুষ যে ঝুঁকি নেয়, তাতে একমাত্র আনন্দ ছাড়া অন্য কোনও বাস্তব লাভ হয় না। তবু মানুষ ছুটছে। মেজর কিংবা ডিমক সেই জাতের মানুষ। কিন্তু যারা বা যে ওই হিরেটার দখল পেতে চাইছে, তারা যে সুবোধ ব্যক্তি হবে, এমন ভাবার কারণ নেই। লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে নিউইয়র্কে ভাড়াটে চোর পাঠায় যারা হিরেটার সন্ধানে, না পেয়ে ফিরে আসার পথে প্লেনে সেই চোরটাকে যারা স্বচ্ছন্দে মেরে ফেলতে বা আত্মহত্যা করাতে পারে, তারা খুব সহজে পিছু ছাড়বে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। প্রথম প্রশ্ন, হিরেটা হেনরি ডিমকের কাছে রয়েছে এই তথ্য এরা জানল কী করে। স্পষ্টত, সেই জুহুরি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে তা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। চোরটা এত প্লেন থাকতে ঠিক আজকেই এবং একই প্লেনে এল কেন মরতে?

এইসময় টেবিলের ওপর রাখা রিসিভারের তলার আলোটা দপদপ করতে লাগল, এবং যন্ত্রটা থেকে বিপ-বিপ শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। এরকম টেলিফোন অর্জুন জীবনে ছাখেনি। সে রিসিভার তুলে নিতেই ওপাশ থেকে জড়ানো মার্কিন ঢংয়ের ইংরেজিতে কেউ প্রশ্ন করল, "আমি কি সেই ইণ্ডিয়ান ছোকরার সঙ্গে কথা বলছি, যার পাশের ছেলেটি আজ প্লেনে মারা গিয়েছে?"

"হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?"

"চমৎকার। মৃত্যু বারবার খালি হাতে ফিরে যায় না।" কথাটা শেষ হওয়া মাত্র লাইনটা কেটে গেল। হতভম্বের মতো কয়েক সেকেণ্ড বসে থাকল অর্জুন। তারপর রিসিভার রেখে ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসল। অর্থাৎ তারা যে এখানে উঠেছে, আলাদা ঘরে আছে, তা প্রতিপক্ষের জানা। ব্যাপারটা আর সহজ জায়গায় নেই। টেলিফোনে ভয় দেখানোর কায়দা খুব পুরনো। কিন্তু সতর্ক থাকতেই হবে। যারা আগ্রহী, তারা ধরা না দিক, দর্শন দিতে দেরি করবে না। ওর খুব ইচ্ছে করছিল হিরেটাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে।

৪

ঠিক আটটায় ওরা হোটেল ছেড়ে বের হল। কিছুদিন আগে একটা চমৎকার সামারজ্যাকেট কিনেছিল অর্জুন, মেজরের সঙ্গে, টাইমস্কোয়ারের একটা দোকান থেকে। সেটা চাপানোয় এখন গরম লাগছে। লস অ্যাঞ্জেলিসের আবহাওয়ায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরার মতো। নিউইয়র্কের ভয়ঙ্কর শীতের ছায়াও এখানে নেই।

ওরা খানিকটা হাঁটতে মেজর লাঠিটা ঠুকে ফুটপাতের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অর্জুন দেখল, ফুটপাতের ওপর পেতলের প্লেট সার-সার আটকানো। প্রতি প্লেটে এক-একজন বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী অথবা পরিচালকের নাম খোদাই করা। ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস, ক্যাথরিন হেপবার্ন, গ্রেগরি পেক, রক হাডসন, গ্রেটা গার্বো থেকে শুরু করে চার্লি চ্যাপলিন, হিচকক, সর্বত্র ছড়িয়ে। এঁদের ওপর দিয়ে মানুষজন হেঁটে যায়। হাঁটার সময়ে প্রতিটি পদক্ষেপে মনে হয়, এঁরা ছিলেন। হেনরি বললেন, "ফুটপাতের প্লেটে নাম না-ওঠা পর্যন্ত হলিউডের শিল্পী-পরিচালকরা জাতে ওঠেন না।" অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। সে জানল, খোদ হলিউড এখান থেকে বেশি দূরে নয়। বস্তুত এখানেই তাব কিছুটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ডানদিকে এক জাপানি বাজিকর বাজি দেখাচ্ছে টিকিট বিক্রি করে। প্রেক্ষাগৃহের সামনে জাপানিদের ভিড়। টেলিফোনের হুঁশিয়ারির কথাটা অর্জুন এখনও মেজরকে জানায়নি। জানালে উনি যেমন বুক চিতিয়ে, থ্রি পিস স্যুট পরে লাঠি ঝুলিয়ে হাঁটছেন, তেমন হাটতেন কি না সন্দেহ। হেনরি ডিমকও বেশ সাজগোজ করছেন।

সাহেব দরোয়ান সেলাম করে দরজা খুলে দিতেই একটা রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে গেল ওরা। চোরা আলোর ব্যবস্থা থাকলেও টেবিলে টেবিলে মোমবাতি জ্বালিয়ে খাবার সার্ভ করে এরা। কোণের দিকে একটা টেবিলে বসল ওরা। অর্জুনের মনে হল জায়গাটা বেশ অভিজাত। মেজব এবং হেনরি হলিউডের ইতিহাস নিয়ে গল্প করছেন। ব্যাপারটা সত্যিই মজাদার, কিন্তু অর্জুনের নজর চারপাশে ঘোরায় সে মন দিতে পারছিল না। মৃত্যু বারবার খালি হাতে ফিরে যায় না। যারা তাদের সব খবর রাখছে, তারা নিশ্চয়ই এখানে অনুসরণ করে এসেছে। কিন্তু এখানে এই অভিজাত জনসাধারণের মধ্যে কে তাদের লক্ষ করছে, তা ধরা শক্ত। সে চোখ ঘোরাতেই চমকে উঠল। ঠিক তাদের পাশের টেবিলে এক ভদ্রমহিলা একজন কিশোরের সঙ্গে খাচ্ছেন। ভদ্রমহিলাকে তার

খুব চেনা মনে হচ্ছে। এবং তখনই নামটা মাথায় এল, সোফিয়া লোরেন। জলপাইগুড়ির সিনেমা হলে সে 'টু উইমেন', 'ইয়েসটারডে টুডে টুমরো' দেখেছে। লম্বা স্বাস্থ্যবতী ভদ্রমহিলা, মুখ ফেরাতেই মনে হল বয়স হয়েছে, কিন্তু খুব পালটাননি। সে কোনওদিন সোফিয়া লোরেনের এত কাছে বসে থাকবে ভাবা যায়? এই সময় আর এক লম্বা ভদ্রলোক সাদা হাফস্লিভ আর খয়েরি রঙা প্যান্ট পরে অতি সাধারণ ভঙ্গিতে সোফিয়া লোরেনের টেবিলে এসে কিশোরের মাথায় হাত বুলিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। এবং বসামাত্র অর্জুন প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। মেজর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হল?"

"গ্রেগরি পেক।' 'গান্‌স অব নাভারোন'-এর নায়ক, 'রোমান হলিডে'...।"

হেনরি ডিমক বললেন, "এখানে তো প্রায় সব ফিল্মস্টার খেতে আসেন। চোখ মেলে থাকলেই সবাইকে দেখতে পাবে। এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে ওঁরা বিরক্ত হতে পারেন।"

অর্জুন সেটা জানে। কিন্তু এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে নিজেকে সামলানো শক্ত হল। হেনরি অর্ডার দিয়েছিলেন, এখন সেটা পরিবেশিত হল। কিছুটা খাওয়ার পর অর্জুনের আর খেতেই ইচ্ছে করছিল না। এই মুহূর্তে যে সে সব বিস্মরিত। 'গান্‌স অব নাভারোন'-এ পাহাড়ে ওঠার সময় গ্রেগরি পেক একটা গর্তে হাত ঢোকানোমাত্র বিশাল একটা বাজপাখি চিৎকার করে বেরিয়েছিল, সেই দৃশ্যটার কথা বারবার মনে পড়ছে। এইসময় মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, খাবে না?"

"আর ভাল লাগছে না। কিন্তু নষ্ট করতেও ইচ্ছে করছে না।" অর্জুন জানাল।

মেজর বললেন, "জোর করে খেয়ো না। দাও, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।" তিনি অর্জুনের বাটিগুলো টেনে নিতেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা চিন্তা অর্জুনের মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল।

মেজর তখন কাঁটা-চামচ দিয়ে অর্জুনের খাবার আক্রমণ করেছেন। ধরা যাক ওই স্মোকড চিকেনে বিষ মেশানো আছে। ওটা অর্জুনের পেটে যেত। এখন মেজর খেয়ে নিতেই আততায়ী লক্ষ-ভ্রষ্ট হল। প্লেনেও তো একই ব্যাপার হতে পারে যে ছেলেটি খুন হল, সে জানত না অর্জুনের জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেচারা খিদের চোটে সেটাই খেয়ে নিয়েছিল। অর্জুন যে পার্কিং লটে গিয়ে খবর নিয়েছে, রিনসেক কোম্পানিতেও হাজির হয়েছিল, তা যদি প্রতিপক্ষের জানা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে জোন্স অ্যাণ্ড জোন্স কোম্পানির ব্যাপারটাও অজানা নেই। সেক্ষেত্রে ওরা যদি তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা…হ্যাঁ, তাই তো, নইলে বলবে কেন, মৃত্যু বারবার খালি হাতে ফিরে যায় না। সে বিল মেটানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর হেনরি ডিমককে বলল, "আমি এয়ারপোর্টে যাব।"

হেনরি অবাক, "কেন?"

একটু ইতস্তত করে অর্জুন তার সন্দেহের বিষয় এবং টেলিফোনের কথাটা জানাল। সব শুনে মেজর হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন, "এজন্যে এয়ারপোর্ট অথরিটির কাছে যাওয়ার কী দরকার! এসব কথা বিস্তারিত জানাতে গেলেই হিবেটার কথাও বলতে হবে। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি। সি ওয়ার্ল্ড থেকে ঘুরে এসে না হয় সব বলা যাবে।"

হেনরি বললেন, "তা ছাড়া অনুমানটায় একটা বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বিষ মেশালো কে? প্লেনে যে খাবার সার্ভ করা হয়, তা অত্যন্ত দায়িত্ববান কেটারার সাপ্লাই করে। যদি বিশেষ একটি প্লেটে বিষ মেশানো থাকে, তা হলে সেই প্লেটটা বিশেষ এক যাত্রীর কাছে সে পৌঁছে দিতে পারে না। তোমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তা হলে বিষটা মিশিয়েছে যে এয়ারহোস্টেস, তোমাকে প্লেটটাও দিয়েছে সে-ই। এয়ারলাইনসের কোনও হোস্টেস এমন কাজ করবে না। কারণ তাতে তার সরাসরি ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আমি কিছু জানি না। কিন্তু এ ছাড়া ওর মরে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। থাকলে টেলিফোনটা আসত না।"

হেনরি বললেন, "তা হলে আমি একটা ফোন করছি এয়ারপোর্ট অথরিটিকে। তোমাদের গলা শুনলে ওরা বুঝতে পারবে যে, আমেরিকান নয়।"

রাস্তার পাশেই একটা বুথে ঢুকে পড়লেন হেনরি। মেজর লাঠি দিয়ে ফুটপাত ঠুকছিলেন। অর্জুন সেদিকে তাকিয়ে হাসল। মেজর কি নার্ভাস? ওই লাঠির ভেতরে লুকনো সম্পত্তিটির জন্যে একদল লোক এখন মরিয়া। এবং তারপরেই মনে হল, খাবারের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকা মাত্রই সে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, বেরোবার আগে পাশের টেবিলের দিকে তাকাতেই ভুলে গেছে।

এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। অথচ অন্ধকারের বালাই নেই। বিকেল-বিকেল ছায়া মেলেছে শুধু। সে দেখল, পথের পাশেই একটা স্ট্যাচু রয়েছে। একজন মানুষ এক পায়ে দাঁড়িয়ে টুপি পেতে রয়েছে। সে কয়েক পা এগিয়ে স্ট্যাচুটার সামনে দাঁড়াল। বাড়ানো টুপিতে বেশ কিছু ডলার পড়েছে। স্ট্যাচুকে কেউ ভিক্ষে দেয়? যে মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই স্ট্যাচুর একটা চোখ বন্ধ হয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল। চমৎকার। এটাও এক ধরনের অভিনয়, এই স্ট্যাচু সেজে থাকা। খুব কষ্ট হচ্ছে মানুষটার, হাত পা মুখ মায় সমস্ত শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে। শুধু পয়সার জন্যে?

হেনরি বেরিয়ে এসেছেন দেখে অর্জুন ফিরে এল। হেনরি মাথা নাড়লেন, "ইউ আর রাইট। আমি রিপোর্টার পরিচয় দিতে ওরা জানাল, লোকটির পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছে। বিষক্রিয়া শুরু হবার তিন মিনিটের মধ্যে হার্ট ব্লক হয়েছে। লোকটা যে খাবার খেয়েছিল, তাতেও একই বিষ পাওয়া গিয়েছে। সন্দেহভাজন হিসেব ওরা এয়ারহোস্টেস ও কেটারারের লোককে গ্রেফতার করেছে। এখন ওরা সেই ইণ্ডিয়ান ছেলেটির খোঁজ করছে, যে ওর পাশে বসেছিল।"

শোনামাত্র অর্জুনের শরীরে শীতল স্রোত বয়ে গেল। লস অ্যাঞ্জেলিসের পুলিশ তাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করবে? সে খামোখা ওই ছেলেটাকে খুন করতে যাবে কেন? তারপরেই সেই অফিসারের দৃষ্টি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে যখন মৃতদেহ খুঁটিয়ে দেখছিল, ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একদম অজানা সহযাত্রীর পায়ের জুতোর তলা কেউ খুঁটিয়ে দেখে না। সে নিজেই ওদের হাতে সন্দেহের সূত্র তুলে দিয়ে এসেছে।

মেজর চিৎকার করে উঠলেন, "ইণ্ডিয়ান ছেলে? মানে তুমি? তোমাকে খুঁজলেই হল? মামদোবাজি? চলো, আমরা সবাই মিলে এয়ারপোর্টে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এর মানে কী?"

অর্জুনের সত্যি অস্বস্তি হচ্ছিল। ওরা ইচ্ছে করলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবে না যে, সে খুন করেছে। কিন্তু এখন এয়ারপোর্টে গেলে আর হিরের ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা যাবে না। অবশ্য পুলিশ যদি ইচ্ছে করে, তা হলে হোটেলেই তাকে ধরতে পারে। সে হেনরি ডিমকের দিকে তাকাল। ডিমকসাহেবের যদি শুধু সি-ওয়ার্ল্ডে গিয়ে দুটো হিরের মিলিত আলো দেখাই উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সেটা পুলিশের সঙ্গে গিয়েও দেখা যেতে পারে। তিনি আলাদা যেতে চাইছেন কেন?

হেনরি বললেন, "অবশ্য পুলিশ যে খুঁজছে, তা আমাদের জানার কথা নয়। চলো, হোটেলে ফিরে যাই।"

আবার হাঁটা শুরু হতেই অর্জুন মুখ ফিরিয়ে সেই স্ট্যাচু হয়ে থাকা লোকটির দিকে তাকাতেই দেখল, সেখানে কেউ নেই।

৫

ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভিং-সিটে হেনরি ডিমক, তাঁর পাশে অর্জুন, পেছনের আসনে মেজর শরীর এলিয়ে রেখেছেন। এখন সকাল। লস অ্যাঞ্জেলিস শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটছে চওড়া হাইওয়ে ধরে। রাস্তার ওপরে পথ-নির্দেশ টাঙানো। ইংরেজি অক্ষর, কিন্তু নামগুলো ইংরেজি নয়। এই এলাকাটায় স্প্যানিশ নামের ছড়াছড়ি। একটু আগে মেজর এই অঞ্চলের ইতিহাস বলছিলেন। ইংরেজরা যেমন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে থেকে গেল, তেমনি পোর্তুগিজ এবং স্পেনীয়রা এদেশে এসেছে, থেকেছে। কালিফোর্নিয়াতে তাই স্প্যানিশ ভাষা এবং নামের বহুল প্রচলন আছে।

গত রাত্রে চমৎকার কাণ্ড ঘটেছে হোটেলে। মাঝরাত্রে কেউ বা কারা তাদের দুটো ঘরে হানা দিয়েছিল। সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করেছে, এবং বোঝা যাচ্ছে, আগন্তুকরা মন খারাপ করে ফিরে গিয়েছে। তবে তারা জুতোর শুকতলা পর্যন্ত উলটে দেখেছে, কিন্তু হ্যাট-র‍্যাকে ঝোলানো মেজরের লাঠিটা ছোঁয়নি। অর্জুনের সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু সেগুলো এলোমেলো করে রেখে গেছে ওরা। আর এটা ঘটেছে ওরা যখন ঘরেই ছিল। এমন কিছু ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে ওদের ঘুম ভোরের আগে না ভাঙে। সকালে এসব দেখে মেজর হোটেল-কর্তৃপক্ষের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে খেপে উঠেছিলেন। হেনরি তাঁকে বুঝিয়েছেন, সেটা করলে পুলিশ ওদের হদিস জেনে যাবে। যখন আসল জিনিস খোয়া যায়নি, তখন এ নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। সকালেই ওরা ব্যাপারটা সম্পর্কে মুখ বন্ধ করে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি ভাড়া করে।

মাঝে-মাঝে দু'পাশে ঢেউ-খেলানো সবুজ মাঠ, চটজলদি এসে-

যাওয়া রঙিন একগুচ্ছ বাড়ি, আর হাইওয়েতে সমুদ্রাভিমুখী গাড়ির ভিড় দেখতে দেখতে ওরা স্যান ডিয়াগোতে এসে পৌঁছল। এখন দশটা বেজে গেছে। শহরে ঢুকলেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু লোনা জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

হেনরি কোথাও না থেমে একটা বিশাল পার্কিং লটে পৌঁছে গেলেন। অন্তত তিনটে ফুটবল-মাঠ জুড়লে এত বড় পার্কিং লট হতে পারে। থিকথিক করছে গাড়ি। মেজর আর অর্জুনকে একটা জায়গায় নামিয়ে, তিনি গাড়ি পার্ক করতে গেলেন। বেশ ভাল ব্যবস্থা। পরিচয়পত্র দেখিয়ে, গাড়ি ভাড়া নিয়ে, সারা দেশ ঘুরে বেড়ানো যায়।

অর্জুন বাঁ দিকে তাকাল। পাঁচিল-ঘেরা একটা বড় বাড়ির ওপর লেখা রয়েছে সি-ওয়ার্ল্ড। ভিড় দেখা যাচ্ছে তার সামনে। অর্জুন মেজরকে বলল, "আমরা তো ওদিকেই যাব, না?"

"বোধহয়। তবে হেনরির জন্যে অপেক্ষা করা ভাল। দলবদ্ধ হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।" অর্জুনের মনে হল মেজর বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

ওরা যখন টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল, তখন আশেপাশে কেউ নেই। ঢোকার সময় একটা নোটিস দেখে অবাক হয়েছিল অর্জুন। তাতে লেখা আছে, "কোনও হরেকৃষ্ণ প্রচার এই এলাকায় চলবে না।" নিউইয়র্কে ওর চোখে সাহেব বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী পড়েছে। এখানে তাদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা কেন, তা বুঝতে পারল না।

হেনরি বললেন, "আমাদের তিনজনের একসঙ্গে হাঁটাটা ঠিক হবে না। দাঁড়াও, সি-ওয়ার্ল্ডের ম্যাপটা নিয়ে নিই।"

পাশের কাউন্টার থেকে তিনঠি ম্যাপ নিলেন হেনরি। সমুদ্রের তলায় যাদের বাস, তাদের নিয়ে নানান মজাদার ব্যবস্থার আয়োজন আছে বিভিন্ন ব্লকে। সব কিছু ঘুরে দেখতে গেলে একটা দিন ফুরিয়ে যাবে। হেনরি আঙুল রাখলেন যেখানে হাঙরদের আস্তানা। বললেন, "ঠিক দু'ঘণ্টা পরে আমরা তিনজনে এখানে উপস্থিত হব।

ঘড়ি মিলিয়ে নাও সবাই। এই দু'ঘণ্টা আমরা আলাদা-আলাদা ঘুরব। মেজর, লাঠিটা এবার আমাকে দেবে নাকি?"

অর্জুন প্রতিবাদ করল, "যদি কেউ আমাদের অনুসরণ করে থাকে সে নিশ্চয়ই লাঠিটার হাতবদল লক্ষ্য করবে।"

হেনরি একটু হতাশ হলেন বলে মনে হল। তারপর ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে তিনজনে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েক পা' এগিয়ে অর্জুন ঠিক করল, সে মেজরের অজান্তে ওঁর পেছন-পেছন ঘুরবে। যদি কেউ মেজরকে অনুসরণ করে, তাহলে সেটা তার চোখে পড়বে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে সে মেজরের পেছনে হাঁটছিল। ছেলে-মেয়ে-বুড়োর ভিড় চারধারে। আইসক্রিম থেকে বুড়ির মাথার পাকা চুল বিক্রি হচ্ছে এখানেও। মেজর মাঝে-মাঝেই ঘড়ি দেখছেন এবং লাঠি ঘুরিয়ে হাঁটছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও অনুসরণকারী চোখে পড়ল না। হাতের ম্যাপ দেখে মেজর এবার একটা সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন। প্রচুর মানুষ তাঁর আগে-পিছে উঠছে। অর্জুন পা চালাল। ওপরে উঠে অর্জুন দেখল একটা ছোট্ট স্টেডিয়াম। সামনে মাঝারি সুইমিং পুল। তার নীল জল টলটল করছে। স্টেডিয়াম লোকে ভর্তি। সে মেজরকে খুঁজে বের করে ধীরে-ধীরে ওঁর দুটো সারি পেছনে গিয়ে বসল।

একটু বাদেই অনুষ্ঠান শুরু হল। একজন মানুষ সুইমিং পুলের ওপাশ থেকে জলের গায়ে এসে দাঁড়িয়ে শিস দিতেই জলে আলোড়ন শুরু হল। ওদের চমকে দিয়ে জল কাঁপিয়ে দুটো ডলফিন সেই মানুষটির নির্দেশে মজার খেলা দেখাতে লাগল। শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া বল জল ছেড়ে ভারী শরীর নিয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে প্রায় হেড দেবার ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। সুন্দরী এক মহিলা ডলফিনের পিঠে চড়ে অনেকটা ঘুরে বেড়ালেন। শেষ পর্যন্ত ডলফিনটি সবাইকে চমকে দিয়ে তার ট্রেনারকেই জলে ফেলে দিতে সমস্ত স্টেডিয়াম হোহো করে হেসে গড়িয়ে পড়তে অর্জুনের নজরে এল, মেজর নেই।

সে দেখল, মেজরের লাঠিটা একপাশে পড়ে আছে, জায়গাটা ফাঁকা। অর্জুন দ্রুত উঠে গেল হেসে লুটিপাটি লোকগুলোকে কাটিয়ে। তখনও মজার খেলা চলছে। "এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি," বলতে বলতে সে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে ওপরে উঠে আসতেই দেখতে পেল, মেজর হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর দু'পাশে দুটো লোক ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটছে। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুনের মাথার ভেতরে চিন্তাটা চলকে উঠল, লাঠিটাকে ত্যাগ করতে হবে। তার বয়সী ছেলে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায় না। দ্রুত প্যাঁচ খুলে ঝাঁকাতেই হিরেটা বেরিয়ে এল। লাঠিটাকে আবার ঠিক করে পাশের দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দ্রুত নেমে পড়ল অর্জুন।

মেজর নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছেন না। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে পাশের লোকদুটোর কাছে অস্ত্র রয়েছে। অর্জুন যথেষ্ট দূরত্ব রাখছিল। এখন কী করা যায়, বুঝতে পারছিল না সে। আর যাই হোক, ওদের নজর এড়িয়ে তাকে মেজরকে সাহায্য করতে হবে। সেটা কী করে সম্ভব?

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে লোকদুটো যেভাবে মেজরকে নিয়ে হাঁটছে তাতে বোঝা যায় ওরা এসব ব্যাপারে রীতিমত পেশাদার। সি-ওয়ার্ল্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে ওরা দাঁড়াল। অর্জুন লক্ষ্য করল, এদিক দিয়েও বাইরে বেরিয়ে যাবার পথ আছে। একটা আইসক্রিমের দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুন ওদের লক্ষ্য করছিল। সেইসময় একজন দাড়িওয়ালা লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা মেজরকে কিছু প্রশ্ন করল। কিন্তু মেজরের দুই প্রহরী পাশ থেকে সরছিল না। মেজর মাথা নাড়লেন। বোধহয় তিনি অস্বীকার করছেন। আর এইসব হচ্ছে হাজার-হাজার লোক যেখানে ঘুরছে, সেখানে, দিনদুপুরে। দাড়িওয়ালা আরও কিছু কথা বলার পর মেজর একইভাবে মাথা নাড়লেন। দূরে থাকায় অর্জুন ওদের সংলাপ শুনতে পাচ্ছিল না। এবং তার পরেই বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটল। ওদিকের একটা ঝোপ থেকে আরও

দুটো। লোকের মাঝখানে হেঁটে এলেন হেনরি ডিমক। তাঁর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। দাড়িওয়ালা লোকটি হেনরিকে দেখিয়ে মেজরকে কিছু বলতে মেজর চিৎকার করতে গিয়ে যেন থেমে গেলেন। হেনরি মাথা নেড়ে কিছু বললেন। তাঁর অবস্থাও যে মেজরের মতো, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। অর্জুনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আচমকা তাকে সতর্ক করল। কারণ দাড়িওয়ালার হুকুমে একটি লোক তখন ছুটছে সুইমিং পুলের দিকে। অর্থাৎ লাঠিটার কথা মেজর বলতে বাধ্য হয়েছেন। একটু বাদেই ওরা যখন লাঠিটা খোলার পর দেখবে যে, ওতে হিরে নেই, তখন

অর্জুন হঠাৎ একটা ছায়া দেখল বাঁ চোখের কোণে। ছায়াটা মানুষের, কিন্তু নড়ছে না। সে আর দাঁড়াল না। উলটো দিকে জোর পায়ে কিছুটা হাঁটতেই মনে হল ছায়াটা পিছু-পিছু আসছে। চোখের সামনে একটা পুলিশ বুথ। দুজন স্বাস্থ্যবান পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে। কিছু না ভাবতে পেরে অর্জুন সোজা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "আমার দুজন সঙ্গী খুব বিপদে পড়েছেন। তাঁদের কেউ বন্দুক দেখিয়ে আটকে রেখেছে।"

"কোথায়?" একজন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

"ওই ওপাশে, আইসক্রিমের দোকানের উলটো দিকে।"

"অ্যাঁ? সি-ওয়ার্ল্ডের ভেতরে? পাগল! নিজের কাজে যাও।"

অর্জুন কী বলবে বুঝতে পারছিল না। সে চারপাশে তাকিয়ে কোনও অনুসরণকারীর ছায়া দেখতে পেল না। লোকটা আবার ধমকের গলায় বলল, "গেট লস্ট।"

তখন অর্জুন পকেট থেকে সেই কার্ডটা বের করল। কার্ডের লেখাটা পড়ে পুলিশ দুটোর চেহারা পাল্টে গেল। অর্জুন ওদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটল আইসক্রিমের দোকানের দিকে। দ্বিতীয়জন বুথ থেকে টেলিফোনে অন্যদের খবর দিচ্ছিল।

কেউ কোথাও নেই। জায়গাটা যেন মুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। পুলিশটি ওর দিকে আবার অবিশ্বাসের চোখে তাকাল।

অর্জুন তাকে বোঝাতে চাইছিল, ব্যাপারটা তার মনগড়া নয়। কিন্তু লোকটা আর কোনও কথা শুনতে রাজি নয়। ওরা আবার বুথে ফিরে আসতে দ্বিতীয় পুলিশটি ওকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার পাসপোর্ট সঙ্গে আছে?"

অর্জুন মাথা নেড়ে সেটা এগিয়ে দিতেই লোকটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "লস অ্যাঞ্জেলিস পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। তোমাকে গ্রেফতার করা হল।"

অর্জুন হতভম্ব হয়ে বলল, "কেন?"

"আমি জানি না। তোমার খবরটা টেলিফোনে হেড কোয়ার্টার্সে জানানোমাত্র ওরা বলল একজন ভারতীয় যুবককে খোঁজা হচ্ছে, যার নামের সঙ্গে তোমার কোনও ফারাক নেই।"

"আমাকে খুঁজলেই গ্রেফতার করতে হবে?"

"পুলিশ গ্রেফতার করার জন্যেই মানুষকে খোঁজে।"

এবার অন্য পুলিশটি বলল, "কিন্তু ওর কাছে যে কার্ড আছে, তা তো অন্য কথা বলছে, জেম্স। বস্‌দের বলো এখানে এসে কথা বলতে।"

অর্জুন বলল, "শোনো, আমি চোর-বদমাশ নই। আমি একজন সত্যসন্ধানী। তোমাদের এখানে হাঙরের বাক্সের যে হিরেটা চুরি গিয়েছে, সেটার ব্যাপারে এসেছি।"

"হাঙরের বাক্সের হিরে?" লোকটা অবাক হল। "তুমি সেটা খুঁজতে এসেছ?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন নরম পুলিশটিকে বলল, "আমি একবার হাঙরের ঘরে যেতে চাই। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে? তোমার ওপরয়ালারা এখানে আসার আগেই আমরা ফিরে আসব কথা দিচ্ছি।"

প্রথম পুলিশটি বলল, "লুক! তুমি একবার বললে তোমার দুজন সঙ্গীকে কেউ বন্দুক দেখাচ্ছে, আবার বলছ হিরে খুঁজতে এসেছ। কোনটা বিশ্বাস করব?"

কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর দ্বিতীয় পুলিশটি ওকে নিয়ে রওনা হল। অর্জুন বুঝতে পারছিল, সরকারি নির্দেশের কার্ড সঙ্গে থাকায় ওরা কিছু করতে সাহস পাচ্ছে না। যেতে যেতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "দ্বিতীয় হিরেটা এখন কোথায় আছে?"

"সেটাও দিন দশেক হল নেই।"

"নেই মানে?"

"প্রথমটা খোয়া গিয়েছিল হাঙর কাচ ভেঙে ফেলার পর। দ্বিতীয়টা এতদিন ওই বাক্সের মধ্যেই ছিল, কিন্তু দশ দিন হল ওটাকে দেখা যাচ্ছে না।"

"দেখা যাচ্ছে না মানে?"

"হাঙরের বাক্সের ভেতরে একটা হুকে ওই হিরেটা ছিল। দিন দশেক আগে দেখা যায়, সেই হুকে কিছু নেই। হাঙরের বাক্সে কেউ হিরে রাখে? যেমন বুদ্ধি!"

"রেখেছিল কেন?"

"কোন এক বিজ্ঞানীর মাথায় কী এক এক্সপেরিমেন্টের ইচ্ছে খেলেছিল!"

কথা বলতে-বলতে ওরা ম্যাপে দেখানো জায়গার কাছে চলে এসেছিল। এদিকটায় বেজায় ভিড়। বাইরে তিনটে চৌবাচ্চায় হাঙরের বাচ্চা ছাড়া রয়েছে। তারা নিরীহ ভঙ্গিতে আপনমনে ঘুরছে। অর্জুন চারপাশে তাকাল। চেনা মুখগুলোকে চোখে পড়ছে না। মেজর এবং হেনরি ডিমকের জন্যে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। যারা বন্দুক দেখিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে চাপ দিতে পারে, তাদের কাছে খুন করা কিছুই নয়।

পুলিশটির সঙ্গে অর্জুন ভিড়ের সঙ্গে মিশে হাঙরের ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। বিশাল হলঘরে প্রকাণ্ড কাচের বাক্সে জল ভরে তাতে হাঙর ছাড়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটা। হাঙরগুলো আপনমনে সাঁতরাচ্ছে। মাঝে-মাঝে এক একটা ভয়ঙ্কর চেহারার হাঙর ছুটে এসে কাচে ঢুঁ মারছে। সেই শব্দ বাইরে

থেকে ভীতিকর শোনাচ্ছে। বাইরের মানুষের মুখ দেখে ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে যখন হাঁ করছে, তখন শিউরে উঠতে হয় বীভৎস দাঁত দেখে। অর্জুনের মনে পড়ে গেল রূপমায়াতে দেখা 'জস' ছবিটার কথা। সবচেয়ে বড় চেহারার হাঙরটাকে অবিকল সেই রকম দেখতে। অর্জুন কয়েক পা এগিয়ে কাচের সামনে দাঁড়াল। বড় হাঙবটার শরীরের সবকিছু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেকটা দূরে পিছিয়ে গিয়ে সেটা তেড়ে এল এমনভাবে অর্জুনের দিকে যে, সে দু'পা না পিছিয়ে পারল না। আব তখনই তার নজরে পড়ল দাড়িওয়ালা লোকটাকে। হাঙবের বাক্সের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে।

হেনরি ডিমক ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন, তা অর্জুন জানে না। কিন্তু সে বুঝতে পাবছিল, তার হাতে আর বেশি সময় নেই। সে চট করে পকেট থেকে হিরেটা বের করে কাচের দেওয়ালের সামনে নিয়ে গিয়ে ঘোরাতে লাগল। কোনও রকম আলো যে এর থেকে বের হচ্ছে, তা অর্জুনের মনে হল না। পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশটি এই কাণ্ড হাঁ করে দেখছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট'স দ্যাট ?"

আর তখনই ঘটনাটা ঘটল। বড় হিংস্র হাঙবটা আর একবার ঢুঁ মারার জন্যে অর্জুনের দিকে ছুটে আসছিল। হঠাৎ সেটা সেই গতি নিয়ে ডিগবাজি খেতে লাগল। যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে জলের ভেতর। অর্জুন হিরেটাকে স্থির রাখছিল। হিরেটা থেকে কোনও আলো বের হচ্ছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হাঙরটা যেন পাগল হয়ে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে কাচের ওপর আঘাত করতে লাগল। অথচ পেছন দিকে সরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই, বোঝা যাচ্ছিল। এবং তখনই অর্জুনের মনে হল, দুটো হিরের আলো একত্রিত হলে যে রেখা তৈরি হয় বলে সে শুনেছে, তা-ই হয়তো হয়ে গেছে। আর তা হলে অন্য হিরেটা নিশ্চয়ই হাঙরটার শরীর রয়েছে। সে দ্রুত অন্য হাঙরদের দিকে

হিরেটা ঘুরিয়ে দেখল, তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ওরা অবাক হয়ে তাদের নেতার দুরবস্থা দেখছে। অর্জুন হিরেটা সামান্য সরাতেই সম্ভবত হাঙরটা কিঞ্চিৎ শক্তি ফিরে পেয়েছিল। দাঁত বের করে সে এবার অর্জুনের দিকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে আবার হিরেটা তাক করল। অর্জুন খেয়ালই করেনি, দর্শকরা ভীত হয়ে কাচের বাক্সটা ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। তারা এবার অর্জুনকেও লক্ষ্য করেছে। পুলিশটি কী করবে বুঝতে পারছে না। এবার হাঙরটা পাগলের মতো পাক খাচ্ছে। অর্জুন চিৎকার করে বলল, "এখানকার কর্তৃপক্ষকে ডাকো। শিগগির!"

চারপাশে ততক্ষণে শোরগোল পড়ে গেছে। পুলিশটি চিৎকার করল, "তুমি কী করছ?"

অর্জুন চোখ না সরিয়েও যেন দাড়িওয়ালা লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। সে পুলিশটিকে বলল, "ওই দাড়িওয়ালাটাকে ধরো। হি ইজ এ মার্ডারার।"

পুলিশটি ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল। অর্জুন কয়েক পা পিছিয়ে এসে দাড়িওয়ালার দিকে নজর দিতেই লোকটা ক্ষিপ্রগতিতে কাচের বাক্সের সামনে দিয়ে ছুটে এল সামনে। অর্জুন অজান্তেই হাঙরটার দিকে হিরেটা তুলে ধরতে অদ্ভুত ব্যাপার হল। দাড়িওয়ালা লোকটা যেন এগিয়ে আসার চেষ্টা করেও পারছে না। তার পিছু হঠার পথ কাচের বাক্স থাকায় বন্ধ। দু'ফুট জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটা ছটফট করছে। চিৎকার করে বলছে অর্জুনকে হিরেটা সরিয়ে নিতে। অর্জুনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। দুটো হিরের সংযোগ-রেখা যদি হাঙরের পক্ষে অতিক্রম করা অসাধ্য হয়, তা হলে মানুষ তো পারবেই না।

এইসময় একজন বৃদ্ধ দৌড়তে দৌড়তে ভেতরে ঢুকলেন। তার পেছনে তিনজন পুলিশ অফিসার। বৃদ্ধ পেছন দিক দিয়ে অর্জুনের কাছে চলে এসে চিৎকার করতে লাগলেন, "ইয়েস, ইটস দেয়ার? হি গট ইট।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল চোখ না সরিয়ে, "আপনি কে ?"

"আমি, আমি প্রোফেসর লুইস জ্যাকব। আমিই ওই বিচিত্র হিরে দুটো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। সেবার একটা হাঙর পাগল হয়ে কাচ ভেঙে ফেলায় একটা হিরে হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যটাকে আমি ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু ওর একার রি-অ্যাক্ট করার ক্ষমতা ছিল না। সেই হিরেটাও অদ্ভুতভাবে মিসিং। অথচ বাক্সটা ইনট্যাক্ট আছে।"

কথা শেষ হওয়ামাত্র অর্জুন বলল, "প্রোফেসর, আপনার ভেতরে রাখা হিরেটা এখন ওই বড় হাঙরটার পেটে। দ্বিতীয়টা আমার হাতে। এটা আমি আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে বন্দী হয়ে থাকা ওই দাড়িওয়ালা লোকটাকে অ্যারেস্ট করতে বলুন।"

হিরেটা সরিয়ে নিতেই প্রোফেসর চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যারেস্ট হিম।"

পুলিসের হাত এড়াবার উপায় ছিল না দাড়িওয়ালার। প্রোফেসর হিরেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। একদম ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল তাঁকে। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে কাচের ওপর হাঙরটাকে লক্ষ্য করে হিরেটাকে চেপে ধরলেন। হাঙরটা ছটফট করল। হঠাৎ জলের রং পাল্টে গেল। লাল ঘোলা জল পেছনে রেখে হাঙরটাকে পেছনের দিকে ছুটে যেতে দেখল সবাই। জল পরিষ্কার হলে একটা সাদা আলোর রেখা দেখা গেল। প্রোফেসরের হাত থেকে বেরিয়ে রেখাটা গিয়ে মিশেছে বালির ওপরে, যেখানে হাঙরটা শুয়ে ছিল। সেখানে এখন দ্বিতীয় হিরেটা পড়ে আছে। প্রোফেসর বললেন, "লেট'স হোপ' ওর উণ্ডটা যেন নিজে থেকেই শুকিয়ে যায়।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে জড়িয়ে ধরলেন, "ইয়ং ম্যান, যেটা এতদিন ধরে করতে চেয়েছি, আজ তা পূর্ণ হল। এবং সেটা তোমার জন্যেই সম্ভব হল। এই দুটো হিরের সমান্তরাল রেখা এক মিটারের মধ্যে এলে হাঙরের পেটে ছিদ্র করতে সক্ষম হয়। জলের বাইরে মানুষকেও আটকে রাখতে পারে। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। হোয়াট'স ইওর গুড নেম ?"

মিনিট দশেক পরে সি-ওয়ার্ল্ডের সিকিউরিটি রুমে বসে অর্জুন হিরের গল্পটা শেষ করল। তারপর দাড়িওয়ালা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "ওদের কোথায় রেখেছেন ?"

দাড়িওয়ালা মুখ খুলল, "ওরা নিজেদের ভাড়া করা গাড়িতেই বসে আছে। পার্কিং লটে গেলেই দেখতে পাবে।"

অর্জুন উঠতে যাচ্ছিল, পুলিশ অফিসার তাকে থামালেন। "আপনি যেতে পারেন না। এয়ারপোর্ট পুলিশ আপনাকে খুঁজছে একটা মার্ডারের জন্যে।"

অর্জুন বলল, "কিন্তু আমি সে মার্ডার করিনি।"

অফিসার বললেন, "সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আপনার চার্জ শুধু আপনার দুই সঙ্গীকে বন্দুক দেখিয়ে আটক রাখার, তাই না ?"

"না।" অর্জুন বলল, "ইনি লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে একজন পেশাদার চোরকে নিউইয়র্কে নিয়ে গিয়েছিলেন হেনরি ডিমকের বাড়িতে হিরে চুরি করানোর জন্যে। আমার বিশ্বাস সেই চোরকে উনিই খুন করিয়েছেন।"

"মিথ্যে কথা।" দাড়িওয়ালা প্রতিবাদ করে উঠতেই অর্জুন আচমকা হাত চালাল। সঙ্গে-সঙ্গে দাড়ির খোলস খুলে মিস্টার রেগনের মুখ বেরিয়ে এল। প্রোফেসর চিৎকার করে উঠলেন, "ওঃ মাই গড। ইটস ইউ ? রেগন !"

রেগন তখন দুই হাতে মুখ ঢেকেছেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "প্রোফেসর, আপনি ওঁকে চেনেন ?"

প্রফেসর মাথা নাড়লেন, "ইয়েস। এই হিরের জন্যে আমার কাছে ও কয়েকবার এসেছে, অনেক টাকা দাম দিতে চেয়েছে। আমি চেয়েছিলাম এই হিরের যাতে অস্ত্র ছাড়া অপারেশন করা যায় তার চেষ্টা করতে। ওকে তাই বিক্রি করিনি। কিন্তু তুমি ওকে চিনলে কী করে ?"

অর্জুন বলল, "ওঁকে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছিলাম নিউইয়র্কের ম্যাকডোনাল্ডে। তখনই ওঁর বাঁ হাতের লাল পাথরের আংটিতে লেখা 'আর' শব্দটা চোখে পড়েছিল। প্লেনে আমাদের

পেছনের সিটে বসে থাকা একজন দাড়িওয়ালা যাত্রীর হাতেও ওই লাল আংটি দেখেছিলাম।...অফিসার, ওকে থামান!"

অর্জুন চিৎকার করে উঠতেই দেখা গেল, লাল আংটির পাথরটা ঘুরিয়ে রেগন সেটা মুখে পুরেছেন। সাদা কিছু গুঁড়ো গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। রেগন হাসলেন, "ব্যস, আমি ফ্রি। হ্যাঁ। আই কিল্‌ড দ্যাট ম্যান। এই আংটির বিষ খাবারে মিশিয়ে দিয়েছিলাম এয়ার-হোস্টেস যখন এই ছোকরার জন্যে খাবার এনেছিল। ওরা নিজেদের আসনে না থাকার সময় ওর প্লেটে ঢেলেছি এয়ার-হোস্টেসের অজান্তে। কিন্তু আমার লোভী লোকটি ওর খাবার খেয়ে নিল লোভের বশে। প্রোফেসর ওই হিরে আপনাকে বিক্রি করেছেন আমার কাকা। তিনি এর মূল্য জানতেন না।" এটুকু বলার পরেই হঠাৎ চিরকালের জন্যে চুপ করে গেলেন রেগন। বাইরের পার্কিং লটে মেজর এবং হেনরি ডিমকের ঘুমন্ত শরীর পাওয়া গেল গাড়ির ভেতরেই। অনেক কষ্টে তাঁদের জাগানো হল। ছেলেটির পেটের বিষের সঙ্গে রেগনের আংটির বিষ মিলে গেল পরীক্ষায়।

নিউইয়র্কে মেজরের ফ্ল্যাটে বসে ওরা গল্প করছিল। এবার দেশে ফিরতে হবে অর্জুনকে। বিষ্টুসাহেব সুস্থ হয়ে উঠছেন, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে দেরি হবে। বন্দুকের ভয়ে লাঠির কথা ফাঁস করায় মেজর মুষড়ে পড়েছেন। রেগনের ভাড়াটে লোকদের পুলিশ ধরতে পারেনি। এইসময় একটা ট্রাঙ্ক কল এল। টেলিফোন ধরে কথা বলে মেজর উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে উঠলেন, "ব্যাটা মার্শাল! ছুঁচো! আমাকে ফাঁকি দিয়ে মুক্তো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে ব্লাকপুলে। চলো অর্জুন, দেশে ফেরার আগে হিথরোতে নামবে আমার সঙ্গে?"

অর্জুন হতচকিত হয়ে বলল, "মার্শাল কে? আর হিথরোটা কোথায়?"

"মার্শাল আমার অভিযাত্রী বন্ধু। হেনরির মতো। আর হিথরো হল লণ্ডনের এয়ারপোর্ট।" মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

পায়ে পায়ে পাহাড়ে

এই দু'কুড়ি বছরে দার্জিলিং-এ গিয়েছি অন্তত উনিশবার, কিন্তু সান্দাকফু যাওয়া হয়নি কখনও। পা থাকলেই যদি পাহাড়ে হাঁটা যায় তাহলে ঘুম থেকে সান্দাকফুর দূরত্ব এমন কিছু নয়, মাত্র একান্ন কিলোমিটার। জিপের রাস্তা শুনেছিলাম তৈরী হয়েছে কিন্তু সেটা প্রায় প্রাণ হাতে নিয়ে যাওয়া। যেতে হলে হেঁটে যাওয়াই শ্রেয় কিন্তু ওরকম ধুধু প্রান্তরে খাড়া খাড়া পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কিলোমিটার ভাঙবো, ভাবতেই অস্বস্তি হতো। অথচ সান্দাকফু হল সেই জায়গা যেখান থেকে পুরো হিমালয়কে ১৮০°তে দেখা যায়। এভারেস্ট এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন স্পর্শের মধ্যে চলে আসে। লোভ হতো কিন্তু সাহসটাই হতো না।

তাসের আড্ডায় আচম্বিতে আমরা পাঁচজন সেই সাহসটাই করে ফেললাম। চল্লিশ যখন ছুঁয়েছি, পঞ্চাশ আসতে দেরী হবে না। শরীরটা অকেজো হবার আগে ঘুরে-আসা যাক। পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা যখন আর নেই এবং আমাদের পশ্চিম বাংলার সম্পদ বলে প্রচারিত তখন হাঁটা শুরু করা যাক।

পাঁচ জনের মধ্যে ছিলেন মুকুন্দ দাস। তাঁর ছাড়া আমাদের কারোর হাঁটার অভিজ্ঞতা নেই। এখন যা অবস্থা হয়েছে দুটো স্টপেজ যেতে ট্রামের শরণাপন্ন হতে হয়। রাজী হবার পরও নার্ভাসনেস যাচ্ছিল না। প্রথমে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর শরণাপন্ন হলাম। সরকারি প্রচারে কখনই আমার তেমন আস্থা নেই। ওঁরা বলে-

ছিলেন, অপূর্ব জায়গা, ট্রেকারদের স্বর্গ। কিন্তু হাঁটতে একটুও অসুবিধে হবে না। পথে অনেক পাহাড়ি গ্রাম পাবেন, রাত্রে শোওয়ার জায়গা পাবেন। সরকারি বাংলো এবং ইয়ুথ হোটেল আছে ছড়ানো। দার্জিলিং থেকে সেগুলোয় জায়গা রিজার্ভ করে রওনা হয়ে পড়ুন। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ নেবেন। বারো হাজার ফুট উঁচু তো।

কলকাতায় লেপ লাগে না অতএব স্লিপিং ব্যাগ চোখে দেখিনি কখনও। নতুন কেনার মানে হয় না। আনন্দবাজারের বিশ্বদেব বিশ্বাস এগিয়ে এলেন। কিছু কিছু সমতলের মানুষকে পাহাড় সবসময়ই চুম্বকের মত টানে। কলকাতায় দেখলাম এরকম প্রচুর মানুষ ছড়ানো। বিশ্বদেব এঁদের একজন। সাদার্ন এভিন্যুর একটি সংস্থা স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক এবং টেন্ট নামমাত্র মূল্যে ভাড়া দেন। বিশ্বদেব তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। দেখলাম প্রচণ্ড ভিড় সেখানে, সবাই পাহাড়ে যাচ্ছে। অতএব হাতে পেলাম না জিনিসগুলো। একটা দল পাহাড়ে যাচ্ছে, তারা শিলিগুড়ি রকেট বাস-টার্মিনাসে ওগুলো আমাদের দিয়ে কলকাতায় ফিরবে ঠিক হল।

এরপরে বাজেট। বিশ্বদেব যা হিসেব করলেন তাতে দেখা গেল পাঁচশো টাকা হলে এক একজন সান্দাকফু-ফালুট-রামাম এবং রিম্বিক হয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে পারবেন। বিশ্বদেব বললেন, ভরপেট নিয়ে কখনও হাঁটবেন না। সঙ্গে শুকনো ফল এবং গ্লুকোজ ডি নেবেন। বিস্কুট আর চিজ রাখবেন প্রচুর। হাঁটতে গেলে জুতো চাই। হান্টিং শু্য হলে ভাল হয়। মুকুন্দ পাঁচজনের জন্যে তাও যোগাড় করে নিয়ে এল।

নতুন ট্রেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে যাওয়ার কোন মানে হয় না। বিকেলে শিলিগুড়ি পেঁছানো মানে দিনটাই নষ্ট। দার্জিলিং মেলই ভাল। ওয়েটিং রুমে স্নান সেরে নিয়ে পাঁচজনে রিক্সায় উঠলাম।

রিকশায় আমার পাশে মদন, বিখ্যাত কুস্তিগীর গোবর গুহ ওর জ্যাঠামশাই। অবশ্য চেহারায় মালুম হয় না মোটেই। মদনের কৌতূহল সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে। শহরটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মশাই, শিলিগুড়ি শব্দটার মানে কি ?'

ব্যাপরটা জানা ছিল। বললাম, "শিলিগুড়ি মূল শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। মূল শব্দ ছিল শ্যালিগ্রি। লেপচাদের ভাষা। নেপালিরা সেটাকে করল শিলগুড়ি। ইংরেজরা বলল শিলিগুড়ি। মূল কথাটার অর্থ, 'ধনুকে ছিলা পরাও।'

মদন বলল, 'বাঃ। যুদ্ধটুদ্ধ হয়েছিল নাকি।'

ঠিক তাই।

তখন সিকিমের সপ্তম রাজা শুক পুট নামগেল-এর আমল। সেটা ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষিত পাঞ্জাবি এবং গোর্খা রাইফেলধারীরা ছিল। লেপচারা প্রাণপণে লড়ে গেল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে। গল্প আছে সেই যুদ্ধে প্রচুর ইংরেজ সৈন্য মারা যায় কিন্তু লেপচাদের পক্ষে মাত্র একটি সৈনিক নিহত হয়। তার নাম ডুনো র‍্যাপগে। ডুনো লেপচাদের নায়ক হয়ে গেছে। একটা শুকনো গাছের খোলে লুকিয়ে ডুনো বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে ইংরেজ সৈন্যদের মেরে গেছে। ইংরেজরা প্রথমে তার হদিশ পায়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডুনো আবিস্কৃত হয়। একজন প্রায় আশিক্ষিত সৈনিক কিভাবে এত বীরত্ব দেখাতে পারে তা ইংরেজদের বিস্ময়ে ছিল। ওই গাছের খোলে ডুনো সাত দিন লুকিয়ে ছিল কিন্তু তার শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। কারণ অনুসন্ধানের জন্যে ডুনোর পেট কাটা হয়েছিল। দেখা গেল সে কোন উত্তেজক খাবার খায়নি। কাচিক শ্যায়ম নামে এক উদ্ভিদের পাতা পাওয়া গিয়েছিল তার পেটে। অসম্ভব প্রাণ শক্তি যোগায় এই পাতা। ডুনোর এই বীরত্বে লেপচারা উদ্‌বুদ্ধ হল। প্রতিটি মুহূর্তে ওরা লড়াই-এর জন্যে তৈরী থাকতো। এমন কি রাত্রে ওরা ঘুমুতো হাঁটুতে বুক এবং হাতের মুঠোয় তরোয়াল নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যদের তাড়িয়ে লেপচারা নেমে এল সমতলে। এখানে পঞ্চম পাঞ্জাবি রেজিমেন্ট তাদের প্রতিরোধের জন্যে অপেক্ষা করছিল। নতুন যুদ্ধ আসন্ন জেনে লেপচা কম্যাণ্ডার আতুপ দোলে চিৎকার করে বললেন, 'শ্যালিগ্রি'। কথাটার মানে ধনুকে ছিলা পরাও।

জায়গাটার নাম হয়ে গেল শ্যালিগ্রি। তারপর শিলগুড়ি এবং এখন শিলিগুড়ি।

টাউন স্টেশনের কাছে রেলওয়ে ক্রসিং-এর কাছে আমাদের রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুকুন্দ ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। সকাল দশটায় আমাদের স্লিপিং ব্যাগ দেবার জন্য লোক আসবে। দেরী হলে মুস্কিল হবে। চারধারে তাকিয়ে মদন বলল, 'সব রকম লোক আছে এই শহরে, না?'

'হ্যাঁ। প্রকৃত অর্থেই কসমোপলিটন টাউন। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্র। আগে এখান থেকে কলকাতায় ট্রেনে যেতে লাগত পুরো একটা দিন। এখন সন্ধেবেলায় কলকাতা ট্রেনে চেপে ভোরে শিলিগুড়িতে নামছে। শহর বাড়ছে কিন্তু একটুও পরিকল্পনা নেই কোথাও। যে যেমন পারছে মাথা গুঁজছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা মানুষ, ভারতবর্ষের নানান জায়গা থেকে ধান্দাবাজ মানুষ এখানে ভিড় করছে। পাশেই নেপাল আর বাংলাদেশ বলে চোরাই জিনিসের বিশাল কারবার এখানে। এত বার পশ্চিমবঙ্গের কোন শহরে আছে কিনা সন্দেহ। সিকিম ভুটানের সস্তায় তৈরী মদের ছড়াছড়ি। স্মাগলারদের একটা বাজার আছে এখানে।'

ছাড়া পেয়ে রিকশাওয়ালা জোর পায়ে প্যাডেল ঘোরাল। রকেট বাস টার্মিনাস পর্যন্ত মাত্র চার টাকা ভাড়া। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন শিলিগুড়ির মুখে কিন্তু আটাশ মাইল দূরের শহর জলপাইগুড়ি এখানে থাবা বাড়িয়েছে। এই বিশাল স্টেশন তৈরীর পেছনে জলপাইগুড়ির লোকের দান ছিল বলেই কি এই

সাম্রাজ্যবাদ। মালপত্র নামিয়ে আমরা স্লিপিং ব্যাগের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। ডুয়ার্স, আসাম, সিকিম এবং দার্জিলিং যাওয়ার এক মাত্র এইটে। পাশেই দার্জিলিং-এর বাস স্ট্যাণ্ড। খুব চিৎকার চেঁচামেচি সেখানে।

দুপুর গড়ালো। সামনের হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া সেরেছি কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের দেখা নেই। মুকুন্দ ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। স্লিপিং ব্যাগ ছাড়া যাওয়া বৃথা। অথচ ওদের দশটার মধ্যে আসার কথা ছিল। ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়লাম সবাই। এদিকে দুটো বেজে গেছে। দার্জিলিং-এর বাস স্ট্যাণ্ড ফাঁকা। এতদূরে এসে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। কল্যাণ বলল, অতবড় দার্জিলিং শহরে স্লিপিং ব্যাগ চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না? গিয়েই দেখা যাক।'

চোখের সামনে বাস নেই অতএব চলে আসা সূর্য কাঁধে নিয়ে অ্যাম্বাসাডার ভাড়া করতে হল। সন্ধ্যের আগে দার্জিলিং-এ পৌছাতে চাই। খরচ বাড়ল প্রথম পায়েই, কি করা যাবে। কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না তাদেরও কখনও কখনও কারণ থাকে।

পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে ফেললাম। দার্জিলিং থেকে সকাল সাড়ে সাতটার বাসে চেপে যাব মানেভঞ্জঙ্গ। সাত হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকেই আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে। প্রথম রাত্রিবাস টংলুতে! ওখানে ডি. আই. বাংলো আছে। উচ্চতা দশ হাজার ফুট। পরদিন সকালে টংলু থেকে বেরিয়ে বাইশ কিলোমিটার হেঁটে এগার হাজার ন'শ উনত্রিশ ফুট উঁচু সান্দাকফুতে। একদিন সেখানে কাটিয়ে একুশ কিলোমটার হেঁটে ফালুটে। সেটাও মোটামুটি একই উচ্চতা। তারপর পনের কিলোমিটার হেঁটে নেমে আসব রামাম ফরেস্ট বাংলোয়। রামাম থেকে উনিশ কিলোমিটার রিম্বিক। রিম্বিকের ছয় কিলোমিটার নিচে বাসবোতে থেকে বাস ধবে আমরা আবার দার্জিলিং ফিরে আসবো। ঠিক সাত দিন লাগবে হাঁটাপথে বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু ম্যাপটা যত দেখছি শরীর তত

শিরশির করছে। এত রাস্তা আমি হাঁটবো, এত রাস্তা। দশ হাজার পার হলেই নাকি ব্লিজার্ড বয়, বরফবৃষ্টি হয়। মেঘ ধুয়ে গেলে পায়ের তলায় বরফ জমে। সঙ্গীত বা খেলাধুলায় সাফল্য পেতে গেলে অনুশীলন অবশ্যই দরকার। একমাত্র গল্পলিখিয়েদের শুনেছি সে বালাই নেই। ট্রেকার্‌দেরও কি তাই ?

এর মধ্যে প্রায় ছ' ঘণ্টা কেটেছে। আমরা কার্সং শহরে ঢুকেছি। এটাও লেপচা শব্দ। অর্থ ভোরের উজ্জ্বল তারা। শুকতারা। নেপালিরা শব্দটাকে উচ্চারণ করতো খার্সাং। ইংরেজরা বানিয়ে নিল কার্সিয়ং। বিকেল ফুরিয়ে এল। পুরো দার্জ্যুল্যাঙ্গ দেখা যাচ্ছে। দার্জিলিং-এর মূল উচ্চারণ। এই লেপচা শব্দটির মানে হল ভগবানের বাসস্থান। অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ। পরে সিকিমের ষষ্ঠ রাজা টেণ্ডন নামগেল চৌরাস্তার ওপর অবজারভেটরি হিলে একটা মন্দির তৈরী করে নাম দেন দোর্জেলিং দোর্জের জায়গা, বজ্র।

১৮১৭ এবং ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে সিকিম এবং নেপালের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ব্যাপারটা ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করা হলে জে, ডব্লু, গ্রাণ্ট নামে একজন সাহেব এলেন মধ্যস্থতা করতে। গ্রাণ্ট সাহেব দার্জ্যুলাঙ্গের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে এত মুগ্ধ হন যে তিনি তখনকার গভর্নরজেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে চিঠি লেখেন অবিলম্বে জায়গাটাকে দখল করতে। শুধু স্বাস্থ্যনিবাস নয়, তিব্বত নেপাল ভুটান এবং অধিকৃত ভারতভূমির ওপর ক্ষমতা বিস্তারের কেন্দ্র হিসেবে এর ভৌগোলিক অবস্থান মূল্যবান। কথাটা ইংরেজদের মনে ধরল এবং তারা সিকিমের সপ্তম রাজা শুক পুট নামগেল-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল যাতে অর্থের বিনিময়ে দার্জ্যুলাঙ্গ পাওয়া যায়। এই নামগেল পরিবার ছিলেন ভুটিয়া। যখন ইংরেজদের জালে জড়িয়ে পড়ে রাজা মাত্র তিনশ পাউণ্ডের বিনিময়ে হস্তান্তরে সম্মত হলেন, তখন লেপচা প্রজারা সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করল।

প্রথমে ঠিক ছিল টাকাটা বাৎসারিক খাজনা হিসেবে ইংরেজরা দেবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পয়লা ফেব্রুয়ারি দার্জ্যুলাঙ্গকে ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে নিয়ে এলে সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। ওরা টেণ্ডুল নামগেল প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটিকে অবজারভেটার হিল থেকে তুলে নিচের ভুটিয়া বস্তিতে সরিয়ে দিল। এবং তখন থেকেই ইংরেজরা দার্জ্যুলাঙ্গকে উচ্চারণ করতে লাগল দার্জিলিং। পরবর্তীকালে এখানে বাস করতে আসা নেপালিরা শহরটির নাম করত দার্লিং হিসেবে যদিও সেটা দার্জিলিংকে সরাতে পারেনি।

রোদের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ, ক্যাভেণ্ডার রেস্তোরাঁর নিচে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। সামনেই একটি নেপালি ট্রাফিক পুলিশ, পথে ট্যুরিস্টদেব ভিড়। ঠিক আছে আমরা ডি. সি. চম্পকবাবুর সঙ্গে দেখা করব এবং তিনি আমাদের থাকার জায়গা ব্যবস্থা করেছেন। সামনের একটা দোকান থেকে ডি. সির বাড়িতে টেলিফোন করতেই দ্বিতীয় হোঁচট খেলাম। চম্পকবাবু দার্জিলিং-এ নেই, আগামীকাল ফিরবেন। এর মধ্যে সোয়েটার পরে নিয়েছিলাম প্রত্যেকে তবু যেন ঠাণ্ডা বেড়ে গেল। এখন হোটেল খুঁজতে হবে। হঠাৎ কি মনে হতে গাইড দেখে নম্বর বের করে টেলিফোন করলাম। সুন্দর একটি গলা আমার নাম শুনে উচ্ছ্বসিত হল, 'চলে আসুন আমার এখানে, চা খেতে খেতে ঠিক করা যাবে কোথায় থাকবেন। একটু এগোলেই বাড়িটা দেখবেন। মিডো ব্যাঙ্ক। দু' নম্বর। কোন অসুবিধে হবে না। এরকম সহজ আন্তরিক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বড় একটা শোনা যায় না আজকাল।

ম্যালের ঠিক নিচে তাপসবাবুর বাড়ি। তিন পুরুষ আছেন দার্জিলিং-এ। কোনদিন যে পবিচয় ছিল না তা পাঁচ মিনিট বাদে বোঝা মুস্কিল হল। শ্রীমতী মুখার্জী লক্ষ্মৌর মেয়ে, এমন মিশুকে দম্পতিকে পেয়ে ভাল লাগল। তাপস বললেন, কোন চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চা শেষ হতে না হতেই

অভিজিত চৌধুরী এলেন। বোধহয় ওঁর আনুকুল্যেই আমরা একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম। মুকুন্দর মাথায় তখন স্লিপিং ব্যাগ ঘুরছে। তাপস সেটা শুনে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন, 'হ্যালো ইয়থ হোস্টেল! ক্যাপ্টেন মোক্তান? আমাদের পাঁচ জন বন্ধু এসেছেন কলকাতা থেকে, সান্দাকফু ট্রেক করবেন। স্লিপিং ব্যাগ দরকার। ও কে'! সংলাপ নেপালি ভাষায়। টেলিফোন নামিয়ে বললেন, 'ডান'।

পরদিন দুপুরে তাপসের সঙ্গে আমি গেলাম দার্জিলিং-এর ডি সি চম্পক চ্যাটার্জির অফিসে। পরিচয় পাওয়ার পর চম্পকবাবু জানালেন, আমি তো কোন চিঠি পাইনি। অরুণ লিখলে—'।

আমি কি করব বুঝতে পারছি না। বাংলো যদি না পাওয়া যায় তাহলে সান্দাকফুতে যাত্রা করা বৃথা। চম্পকবাবু তাঁর অফিসকে নির্দেশ দিলেন রিজার্ভেশনের খাতা আনতে। দেখা গেল সান্দাকফুর ডি আই বাংলো আগামী এক মাস খালি নেই। একমাত্র টংলুর বাংলো এক রাতের জন্যে পাওয়া যেতে পারে। যেন দিল্লী যাব সেখানে জায়গা নেই তবে কানপুরে একদিন থাকতে পারেন। ডি আই বাংলো ছাড়া আছে ইয়থ হোস্টেল আর পি ডবলু ডি বাংলো। প্রথমটির দায়িত্ব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের, পরেরটি একজজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের। সেদিন সকাল থেকেই দার্জিলিং-এর টেলিফোন মৃত হয়ে গেছে। তার ওপরে শহরে প্রচণ্ড জলাভাব দেখা দেওয়ার চম্পকবাবুকে ছুটতে হচ্ছে জলপাহাড়ে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কথা বলতে। তাপস বললেন, 'চলুন চেষ্টা করে দেখি।'

ফরেস্ট অফিসে এক নেপালি ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, সান্দাকফুর ইয়থ হোটেল খালি আছে তবে সেটা বাসযোগ্য নয়। মানে দরজা জানলা নেই, জিরোডিগ্রির বাতাসে বড় কষ্ট হবে। তবে রিম্বিক আর রামানের বাংলো বুক করে কাগজ দিচ্ছি। টাকা পয়সা ওখানেই দিয়ে দেবেন'।

তাপস তাকালেন, 'কি করবেন' ?
বললাম, 'যা পাওয়া যাচ্ছে তাই নেওয়া যাক
ওখান থেকে বের হতে হতে পাঁচটা বেজে
বইছে তখন। গাড়ি নিয়ে আমরা ছুটে
এসে দেখলাম পি ডবলু ডি অফিস বন্ধ।
আমায় নিয়ে নেমে গেলেন নিচে, ইঞ্জিনি
পরিচয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপ
মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ।
দাশগুপ্ত সাহেব বললেন, '
আমরা তো বাংলো ভাড়া
থাকতে দেওয়া হয়। তা অ
কয়েকজন অধ্যাপক যাবেন
করব যাতে ওঁরা দুদিন বা
তাই ছাপানো ফর্মের অর্ড
বাংলোর চৌকিদার শ্রীগ
রাত থাকতে দেবার জ
ছাপানো ফর্ম চেনে, ে
পরিচারিকাকে দিয়ে দু
ইয়থ হোটেলে ে
দার্জিলিং-এ বড় একট
ওপরের রাস্তা ধরে
ক্যাপ্টেন মোক্তান বহু
বাড়িয়ে বললেন, 'ে
হাঁটুন, এর চেয়ে আন
'স্লিপিং ব্যাগ পা
'নিশ্চয়ই। কি
আমার ইয়থ হো

ার টাইগার ছিল।
তিরিশেক লাগে।
কিয়াপোখারির বাজার।
নভঞ্জঙ্গ পেঁাছে গেলাম।
নিপাট এবং গ্রাম। উচ্চতা
কট্ও। তাপস বলেছিলেন,
াইড নিয়ে নেবেন। পেশাদার
ঞ্জঙ্গ-এ পাওয়া যায় শুনেছি'।
ধরেছিল। অতিরিক্ত সজাগ এবং
র গায়ে যখন একটা ফুলস্লিভ
ারেক পুরু আচ্ছাদন। উত্তরমেরুতে
পাশাকও ওর ব্যাগে রয়েছে। মালপত্র
ও একটি সুবোধ বালককে নিয়ে হাজির
দ তুই এর সঙ্গে কথা বল'।
র ওপর খাকি জামা পরা ছেলেটা সরল
উজ্জ্বল। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুম
রাম সিং।
হ্যায়' ?
এবার মুকুন্দ আমাকে বলল, 'লোকটাকে
নিয়ে নেওয়া যাক কি বলেন'?
পঁচিশ টাকা নেবে। আমাদের সঙ্গে খাবে।
ুন্দ বাকি কেনাকাটা সেরে নিল। ঠিক সাড়ে
ওনা হলাম। আমাদের স্লিপিং ব্যাগ এখন
সঙ্গে রাম সিং-এর কাঁধে। হালকা লাগছে
, 'ইনহিউম্যান ব্যাপার। অত মাল ওর কাঁধে
ছু না'।
ং-এর এ ব্যাপারে কোন তাপ-উত্তাপ নেই। আগে

অভিজিত চৌধুরী যাট। এখানকার পরিবেশ আপনাকে উৎসাহিত
চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে

ঘুরছে। তাপস সেটা জায়গা বদলানোর কোন মানে হয় না।
ইয়থ হোস্টেল! ক্যা৷গ আর রুকস্যাক নিলাম। তাপস থাকায়
এসেছেন কলকাতা থেকেলা না। ক্যাপ্টেন মোক্তান বললেন,
দরকার। ও কে'! সংলগ্ন নেবেন না। সার্ট, প্যাণ্ট, ফুলস্লিভ
বললেন, 'ডান'। এই যথেষ্ট। হাঁটার সময় দেখবেন
পরদিন দুপুরে তাপসের টতে কষ্ট হবে। বেড়াতে বেড়াতে
সি চম্পক চ্যাটার্জির অফিসে ন। কোনরকম মানসিক চাপকে
জানালেন, আমি তো কোন চিঠি র চীজ রাখবেন। পথে কোন
আমি কি করব বুঝতে পার। হল ট্রেকারদের স্বর্গ। ঘুরে
যায় তাহলে সান্দাকফুতে যাত্রা করা বৃ

নির্দেশ দিলেন রিজার্ভেশনের শ ন হচ্ছিল সান্দাকফু যাওয়া
সান্দাকফুর ডি আই বাংলো আগা ফল আমাদের অভিজ্ঞতা।
একমাত্র টংলুর বাংলো এক রাতের ব করে এনেছে। চীজ,
যেন দিল্লী যাব সেখানে জায়গা নেই ত থেকে শুরু করে কি যে
পারেন। ডি আই বাংলো ছাড়া আ াওয়া ঠিক হল। ও সব
ডবলু ডি বাংলো। প্রথমটির দায়িত্ব ফরে র সমস্ত রোগ সারাবার
একজজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াবের। সেদিন

এব টেলিফোন মৃত হয়ে গেছে। তার ওপ এবং ব্যক্তিগত জিনিষ।
দেখা দেওয়ার চম্পকবাবুকে ছুটতে হ যতে প্রণব বলল, 'বিশ
বাহিনীর সঙ্গে কথা বলতে। তাপস ব ? দুই বগলের ফাঁকে
দেখি।' াগছিল। মুকুন্দ ঠাট্টা
ফরেস্ট অফিসে এক নেপালি ভদ্রলোক ব তাও বইতে পারবি
ইয়থ হোটেল খালি আছে তবে সেটা বাসযো য় যাওয়া বারোয়ারি
জানলা নেই, জিরোডিগ্রির বাতাসে বড় ক দু পেঁয়াজ ঢুকবে
আর রামানের বাংলো বুক করে কাগজ।

ওখানেই দিয়ে দেবেন'। । রাস্তা নেমেছে

শিলিগুড়ির দিকে। বাঁ দিকে কালিম্পং আর টাইগার হিল। ডান দিকের পথ সুকিয়াপোখরির। মিনিট তিরিশেক লাগে। কদিন আগে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সুকিয়াপোখারির বাজার। আরও মিনিট দশেক বাদে আমরা মানেভঞ্জঙ্গ পৌঁছে গেলাম। প্রায় এল্ প্যাটার্নের রাস্তার দুধারে দোকানপাট এবং গ্রাম। উচ্চতা সাত হাজার ফুট কিন্তু ঠাণ্ডা নেই একটুও। তাপস বলেছিলেন, 'হাঁটাপথে যাবেন' রাস্তা চিনতে গাইড নিয়ে নেবেন। পেশাদার নয়, পোর্টার কাম গাইড। মানেভঞ্জঙ্গ-এ পাওয়া যায় শুনেছি'।

কথাটা প্রণবের খুব মনে ধরেছিল। অতিরিক্ত সজাগ এবং আরামপ্রিয় মানুষ। আমাদের গায়ে যখন একটা ফুলস্লিভ সোয়েটার ওর শরীরে গোটা চারেক পুরু আচ্ছাদন। উত্তরমেরুতে ঘোরা যায় এমন একটা পোশাকও ওর ব্যাগে রয়েছে। মালপত্র নামিয়ে চা খাচ্ছি এই সময় ও একটি সুবোধ বালককে নিয়ে হাজির হল, 'এ হল রাম সিং, মুকুন্দ তুই এর সঙ্গে কথা বল'।

ছেঁড়া গরমের প্যান্টের ওপর খাকি জামা পরা ছেলেটা সরল হাসছিল। চোখ দুটো উজ্জ্বল। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুম ফালুট গিয়া হ্যায় ?'

দুবার মাথা নাড়ল রাম সিং।

'রাস্তাঘাট চিনতা হ্যায়' ?

আবার দুবার। এবার মুকুন্দ আমাকে বলল, 'লোকটাকে সরল বলে মনে হচ্ছে, নিয়ে নেওয়া যাক কি বলেন'?

রাম সিং দৈনিক পঁচিশ টাকা নেবে। আমাদের সঙ্গে খাবে। ওকে সঙ্গে নিয়ে মুকুন্দ বাকি কেনাকাটা সেরে নিল। ঠিক সাড়ে দশটায় আমরা রওনা হলাম। আমাদের স্লিপিং ব্যাগ এখন বারোয়ারি বোঝার সঙ্গে রাম সিং-এর কাঁধে। হালকা লাগছে কিন্তু কল্যাণ বলল, 'ইনহিউম্যান ব্যাপার। অত মাল ওর কাঁধে চাপানো ঠিক হচ্ছে না'।

কিন্তু রাম সিং-এর এ ব্যাপারে কোন তাপ-উত্তাপ নেই। আগে

চলল সে মানেভঞ্জঙ্গ ছাড়িয়ে। ডানদিকের রিম্বিকের পথ ছেড়ে আমরা বাঁ দিকের পাহাড়ে পা দিলাম। একদম খাড়া পথ। এই পথে জিপ যায়? ছোট ছোট বোল্ডারে সাজানো পথটায় শুধু একটা জিপ দাঁড়াতে পারে। মিনিট দশেক হাঁটার পর বুকে চাপ পড়তে লাগল মনে হল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। মুকুন্দ ছাড়া আমরা চারজনেই জিরোতে চাইলাম। রাম সিং ওই বোঝা নিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে মুকুন্দ।

ঘণ্টাখানেকের পথচলা বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের শরীরগুলোর সহ্যক্ষমতা কিছুই নেই। সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে এখন দরদর করে ঘামছি, কুকুরের মত হাঁপাচ্ছি। প্রণবের অবস্থা আরও করুণ। ওর অনভ্যস্ত জুতো এর মধ্যেই পায়ে ফোস্কা ফেলেছে। বলল, 'আগে জানলে কোন শালা আসতো। যে হাজার ফুট ওঠেনি তাকে দশ হাজার বারো হাজার যেতে হবে'।

যখন পথটা ঢালু হচ্ছে তখন যেন মনে হচ্ছে বেঁচে গেলাম। এর মধ্যে জিপের পথ ছেড়ে আমরা পায়েচলা পথ ধরেছি। রাম সিং না থাকলে এই পথ চিনতে পারতাম না। দুই উরু টনটন করছে।

মুকুন্দ পিছিয়ে এসে বলল, 'রাম সিং বলছে এভাবে হাঁটলে টংলু পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে'।

একটা নাগাদ চোখের সামনে একটা খামার বাড়ি ভেসে উঠল। এতক্ষণ কোন মানুষ তো দূরের কথা গরু ভেড়াও দেখিনি। পাহাড়ের পর পাহাড় গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে আছে। যে পথ ছেড়ে এসেছি কিছুক্ষণ চলার পর পিছু ফিরে তাকালে বিশ্বাসই হয় না ওখানে একটু আগে ছিলাম। দুধারে অজস্র রডড্রেনডন ফুটে আছে। এত তার রঙের বাহার যে চোখে ধাঁধা লাগে। ঘন জঙ্গল সরে গিয়ে খামার বাড়িটাকে দেখতে পেয়েই উৎসাহ বেড়ে গেল। গ্রামের নাম চিত্রে। কোন রকমে বাড়িটার সামনে পৌঁছে খোলামাঠে বসে পড়লাম। দুঘর বাসিন্দা এই গ্রামের।

কয়েকটা সবল ঘোড়া খেলা করছে। মুরগি ডাকছে সমানে। রাম সিং বাসিন্দাদের বেশ পরিচিত। ওরা আমাদের দেখেই চা এনে দিল। চল্লিশ পয়সার গ্লাস বড় আরামের। গ্রামবৃদ্ধ আমাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, সমতলের মানুষ তাই হাঁটতে কষ্ট হবেই। আর একটু গেলেই মেঘমা। সেখানে ভাল রক্সি পাওয়া যায় তবে তুম্বা খাওয়াই ভাল। শরীর পুষ্ট করে কিন্তু নেশা কম হয়। আর হ্যাঁ, পথে যেন জল না খাই আর ভুট্টা চিবোই। কারণ লোকেতি নামের একটা ফুল এমন গন্ধ ছড়ায় যা মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। অলটিউড সিকনেশ। ভুট্টা তার ওষুধ।

প্রণব খুব ঘাবড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ভুট্টা নেই। একবার বসলে উঠতে ইচ্ছে করে না।

মেঘমায় যখন পৌঁছালাম তখন চারটে বাজে। মুকুন্দ এক বোতল রক্সি কিনে নিল। ওই একটাই বাড়িকে কেন্দ্র করে গ্রাম। চা খেয়ে টংলুর দিকে তাকালাম। মাত্র তিন কিলোমিটার কিন্তু আকাশ ছোঁয়া। শবীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। হঠাৎ পেছন থেকে শুনলাম, 'হ্যালো'! তাকিয়ে দেখি একজন শ্বেতাঙ্গিনী হাসতে হাসতে উঠে গেলেন পাশ কাটিয়ে। পথেও কয়েকজন বিদেশী ট্রেকারকে দেখেছি। প্রণব বলল, 'মাইরি ফিরে গিয়ে কাউকে বলবেন না মেয়েছেলের কাছে হেরে গেছি।'

মদন বলল, 'মেয়েছেলে বলো না। ওটা অসভ্যতা'।

এই সময় ঝড় উঠল। হাওয়ার মুখ ছুঁচলো। যেন বিঁধিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে পাহাড় থেকে। দু পা যাই তো দু মিনিট থামি। সন্ধ্যে পার হয়ে যখন টংলুতে পৌঁছালাম তখন আমাদের শরীর প্রায় নিরক্ত। হু হু করে ঠাণ্ডা বাড়ছে। দশ হাজার চুয়াত্তর ফুট উঁচুতে ডি আই বাংলোটাকে ঠিক হানা বাড়ির মত দেখাচ্ছে। প্রায় আছড়ে পড়লাম আমরা তার ভেতরে। শুধু রাম সিং হাসিমুখে বলল, 'সাব খানা পাকায়েগা'?

বাইরে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। হাউ হাউ করে হাওয়ারা ধেয়ে

আসছে। রাত যত গড়াচ্ছে তত হাওয়ার দাপট বাড়ছে। আমরা পাঁচজন স্লিপিং ব্যাগের ভেতর সেঁধিয়ে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। রাম সিং চৌকিদারের বউ-এর কাছ থেকে কিছু কাঠ যোগাড় করেছে। একটু আগে মদন বোমবাতি জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল। দশ হাজার ফুট উচুঁতে বরফ-হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্যুরিস্টদের জন্যে এই বাংলোটি রেখেছেন। এটি কি অবস্থায় আছে তা দেখার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন না। বাংলোর যে বাথরুমটি ছিল সেটি দীর্ঘকাল অকেজো। ছোট বড় যেকোন প্রয়োজনেই আপনাকে পাহাড়ে যেতে হবে। এইরকম হিমেল রাতে সেটা মৃত্যুদণ্ডের সামিল। জানলায় কাঁচ নেই, হু হু করে বাতাস ঢুকছে। দুটো ঘরে খাট আছে, বিছানাপত্র উধাও। শুনলাম সন্ধ্যের পর চৌকিদার স্থানে থাকে না।

প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাম সিং খিচুড়ি তৈরি করে আনল অথচ খেতে পারলাম না। মুকুন্দ রক্সি বের করল। টকটক, বিশ্রী গন্ধ কিন্তু শরীর গরম হল। স্লিপিং ব্যাগেব মধ্যে শুয়ে ক্রমশ শীত গেল কিন্তু মনে হচ্ছিল একটা খোপের মধ্যে আটকে আছি।

মুকুন্দর চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গল, 'দারুণ সূর্য উঠেছে, উঠে পড় সবাই।' মদন পাশ ফিরে শুল। কল্যাণও।

আপাদমস্তক গরম কাপড়ে মুড়ে রঙিন ছবি তুলে মুকুন্দ খাটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা মশাই না এলেই পারতেন। এখানে এসেও যদি শুয়ে থাকেন তাহলে আসার কোন মানে হয়?'

কল্যাণ ব্যাগের ভেতর থেকেই প্রশ্ন করল, 'পিক্ দেখা যাচ্ছে?'

'না। কিন্তু সূর্যটা—।' মুকন্দকে থামিয়ে কল্যাণ বলল, 'সূর্য পৃথিবীর সব জায়গায় একরকম। ওটাকে দেখার কিছু নেই। আসলে কোন পরিবেশে সূর্যকে দেখছি সেটাই বিচার্য। আমার শরীর খারাপ আজ হাঁটতে পারবো না।'

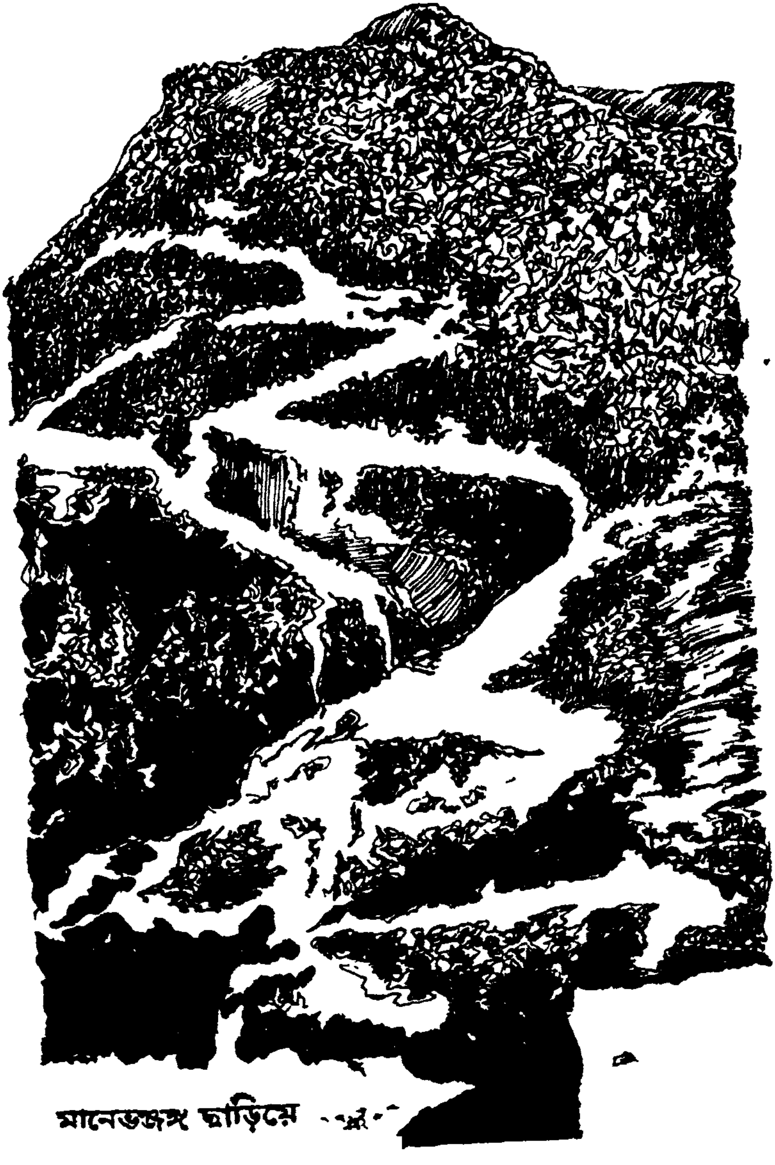

মানেভঞ্জং ছাড়িয়ে

মুকুন্দ ঝাঁপিয়ে উঠল, 'পারবো না বললে হবে? সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। কি কষ্ট হচ্ছে? পায়ে ব্যথা? ঠিক আছে, এই মলমটা—।'

সকাল আটটায় আবার রওনা হলাম। রাম সিং বলল যদি জোরে না হাঁটি তাহলে আজ সান্দাকফুতে পেঁছোতে পারব না। টংলু থেকে সান্দাকফুর দূরত্ব বাইশ কিলোমিটার। মাত্র দু'হাজর ফুট উঁচু হলেও অনেকটা নামতে উঠতে হবে। জিপের পথ ছেড়ে ও আমাদের সটকাটে নিয়ে এল। টংলুতে দেখলাম দু-একটা সরকারি অফিস আছে। কিন্তু লোকজন চোখে পড়ল না।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আমরা বেশ বর্ধিষ্ণু একটা গ্রামে গেলাম। জায়গাটার নাম জৌবাড়ি, নেপালের সীমানায়। এখানে ব্যক্তিগত মালিকানায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। বুঝলাম ভুল করেছি। টংলুর টঙে ওঠার কোন মানে হয় না। মেখমা থেকে অপেক্ষাকৃত আরামের পথে জৌবাড়ি আসা যায়। সময় বেশী লাগে না। সেই এলাম কিন্তু খামোকা কষ্ট হল।

প্রণব এবং কল্যাণের চেহারা দেখে নিজেরটার মালুম পাচ্ছি। ফ্যাকাশে মড়ার মত দেখাচ্ছে। জৌবাড়ি ছাড়াতেই মন ভরে গেল। নীল ছায়া মেখে পাহাড় এখন পায়ের তলায়। আকাশ উপুড় হয়ে আছে তাদের গায়ে। যেন সেই, আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়। পায়ে চলা এই পথের দুধারে অজস্র রডডেনড্রন ফুটে আছে। এত তার রঙের বাহার যে চোখ ফেরানো যায় না। এখন আমরা নামছি তাই কষ্ট কম হচ্ছে। বাঁক ঘুরতেই শুনলাম, 'হ্যালো'। একটি তরুণ এবং বৃদ্ধ বিদেশীকে দেখলাম। অঙ্গে তেমন কোন গরম পোশাক নেই। আলাপ হল, সান্দাকফু থেকে ফিরছে। দুজনেই ব্রিটিশ।

গৈরিবাসে বেশ কয়েকঘর মানুষের বাস। উচ্চতা আট হাজার আটশ ফুট। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম হয়। গৈরিবাস থেকে কালপোখরি একদম খাড়াই পথ। আকাশের দিকে নাক করে

দেখতে হয়। এখানে কোন থাকার জায়গা নেই। অভ্যাস না থাকলে এই পথে হাঁটা সত্যি ভীতিপ্রদ। কয়েক পা এগোলেই মনে হয় দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুটো পা লোহার মত ভারি। পিঠের দশ কেজি বোঝা ক্রমশ পনের থেকে বিশ হয়ে যায়। দুধারে প্রকৃতির রানীর মত সাজ দেখার মন থাকে না। কেবলই মনে হতে থাকে কতক্ষণে লক্ষ্যে পেঁছাবো। সঙ্গীরা এগিয়ে গেলে প্রচণ্ড অসহায় বোধ হয়। এই নির্জন মনুষ্যবিহীন পাহাড়ে আমি একা—এই বোধ অস্থিরতা আনে। প্রতিটি বাঁকের আগে আশা হয় এবার নিশ্চয়ই ঢালু পথ পাব। পায়ের মাপ কমে আসে, রাস্তাটা বড় হয়ে যায়।

কৈয়াকাটা হয়ে কালপোখরি পেঁছাতে তিনটে বেজে গেল। বেশির ভাগ ট্রেকার এখানেই থেকে যান। লামার বাড়ি সেই আশ্রয়স্থল। গরম চা রুটি আর তরকারি পাওয়া যায়। এখান থেকে সান্দাকফু মাত্র সাত কিলোমিটার পথ। ঘণ্টা আড়াই হাতে আছে। প্রণবের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তেই ও পড়ে যেতে পারে। ঠোঁট সাদা। কিন্তু সিদ্ধান্ত হল আজই সান্দাকফুতে পৌঁছাবো। এখানে রাত কাটালে আগামীকালের ভোর সান্দাকফুতে পাব না। প্রণবের আপত্তি টিকল না।

বিকেভঞ্জঙ্গ অবধি শুধু নেমে যাওয়া। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সেখানে। দুই তিন ঘর নিয়ে গ্রামটা। বেশ কিছু মুরগি চরছে। মদন বলল, একটা মুবগি কিনে নিয়ে যাই। পাহাড়ি মুরগির টেস্ট খুব।

একটা ষোল সতের বছরের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, মুরগি কার?

'আমার বউ-এর। কেন, কিনবে? ঠিক আছে, ওকে ডেকে দিচ্ছি।'

ওইটুকু ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং ব্যবসার কথা বউকে দিয়ে বলাচ্ছে। ভাবতে না ভাবতে ছেলেটি যাকে ডেকে নিয়ে এল

তাকে দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। অন্তত পঞ্চাশ বছর বয়স হবে মহিলার। মুখের চামড়া কুঁচকে গেলেও শরীরের বাঁধন ঠিক আছে। মদন অবিশ্বাসের গলায় ছেলেটিকে বলল, 'তোমার বউ?'

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। এবার মনে পড়ে গেল। দার্জিলিং-এর আদি অধিবাসী হল লেপচারা। তখন সিকিমের রাজাই এদের রাজা ছিল। নেপালিরা এল ব্রিটিশরা দখলে নেবার পর। অত্যন্ত পরিশ্রমী লড়াকু কিন্তু সরল জাত ছিল লেপচারা। কিন্তু একটি সামাজিক প্রথার জন্যে কমে আসছে এদের সংখ্যা। পরিবারের কোন পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রীকে আবার বিয়ে দেওয়া হত। প্রথমে ওই পুরুষটির কোন অবিবাহিত ভাই থাকলে তাকেই পাত্র হতে হবে। ভাইদের বিয়ে হয়ে গেলে ভাইপোকে জায়গাটা নিতে হবে। ফলে দেখা গেছে প্রৌঢ়ার সঙ্গে সদ্য যৌবনে আসা তরুণের বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের পর সেই রমণীর সন্তানেরা এই তরুণটিকে বাবা বলে মেনে নিতে বাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রৌঢ়া সন্তানধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। ফলে ওই তরুণটির আর সন্তান হল না এবং এই প্রৌঢ়া স্ত্রী জীবিত থাকতে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। প্রায় বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে লেপচারা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আসছে। হয়তো জমিজমা অন্য পরিবারে যাতে না যায় সেই কারণেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ইংরেজ মিশনারিদের দৌলতে লেপচারা যখন ব্যাপকহারে খ্রীস্টান হয়ে গেল তখনও এই ব্যবস্থার বিলোপ হয়নি। ইদানীং শহরের শিক্ষিত লেপচারা এই প্রথা বাতিল করলেও গ্রামে যে চল আছে তার প্রমাণ পেলাম। দেড় কেজি ওজনের মুরগিটি রাম সিং-এর পিঠের বোঝার ওপর চাপল। ঠ্যাং-বাঁধা অবস্থায় সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল সেটা।

বিকেভঞ্জঙ্গ ছাড়ানো মাত্র ঠাণ্ডা যেন তিনগুণ বেড়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই রোদ নেই। এবার শনশন করে হাওয়াদের সঙ্গে ঘন ফগ উঠে আসতে লাগল নিচ থেকে। মুহূর্তে চারধার

ঢেকে গেল। দু'হাত দূরের মানুষ দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বদেব এবং ক্যাপ্টেন মোক্তান বলেছিলেন, সান্দাকফু-এর আগের পথটাই সবচেয়ে খাড়াই। মিনিট পনের চলার পর হাড়েহাড়ে বুঝলাম সে কথা। অনবরত বাঁক নিয়ে পথটা খাড়াই উঠে গেছে। এখনও তিন কিলোমিটার পথ। প্রণব আর কল্যাণ হাঁটি হাঁটি পা করে এগোচ্ছে। মদন রাম সিং-এর কাছে শেখা একটা শব্দ করে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দুটো পায়ে ফোস্কা পড়েছে, বুকে হাঁফ ধরেছে। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ফগে ঢাকা। কতটা উঠেছি তার হিসেব নেই। মনে হচ্ছিল পথ আর শেষ হবে না। ঠিক তখন ঝড় উঠল। কুচি কুচি বরফ আছড়ে পড়ছিল শরীরের ওপর। মুহূর্তেই ফগেরা উধাও। কিন্তু পায়ের তলায় সাদা কাঁচ জমছে। আমার দুই হাতে কোন সাড় নেই। নাকের অনুভূতি মরে গেছে।

মদনের চিৎকার শুনলাম। উল্লাস। রাস্তার পাশে একটা মাইলস্টোন ধরে চেঁচাচ্ছে, 'এসে গেছি।' তাকিয়ে সেই সন্ধ্যের অন্ধকারে বৃষ্টি মেখে পড়লাম, সান্দাকফু জিরো। কিন্তু কোথায় সান্দাকফু? দুধারে সেই গম্ভীর জঙ্গল আর পাহাড়। কতক্ষণ চলেছি খেয়াল নেই হঠাৎ বাঁক ঘুরতেই একটা কাঠের বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটার জানলা নেই, দরজা ভাঙ্গা। পরপর আরও কয়েকটা। চকিতে সমস্ত শরীর আলোড়িত হল। আমরা পৌঁছে গেছি সান্দাকফু। এই সেই জায়গা যেখান থেকে হিমালয়কে ১৮°তে দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্ট পাশাপাশি ভেসে ওঠে। কিন্তু এখন আমাদের চারপাশে শুধু মেঘ আর অন্ধকার।

এগার হাজার ন'শ উনত্রিশ ফুট উঁচুতে গোটা ছয়েক বাড়ির মধ্যে অবিশ্বাস্য সুন্দর যেটি সেটি পি ডবলু ডি বাংলো। বাংলোর চৌকিদার গণেশ এই আবহাওয়ায় তুরীয় অবস্থায় রয়েছে। ছাপানো ফর্ম ছাড়া সে কোন পাশ চেনে না। নেপালি চিঠিটা

আমাদের বাঁচালো। বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম আমরা। শুধু মুকুন্দ রাম সিং-কে নিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগল। ফায়ারপ্লেসের আগুনে হাত পা সেকে ঘণ্টাখানেক বাদে শরীর যখন সুস্থ হল তখন প্রণব প্রথম কথা বলল, আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার অর্ধেক এসে গেছি।'

রাত তিনটের সময় মুকুন্দ আমাদের ডেকে তুলল। সান্দাকফুর সূর্যকে চিনতে হলে নাকি এইসময় উঠতে হয়। স্লিপিং ব্যাগের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতেই বুঝলাম ঠাণ্ডা কাহারে কয়। নেতা হিসেবে মুকুন্দর তুলনা হয় না কারণ সে এর মধ্যেই রাম সিং এর সাহায্যে গরম কফি তৈরী করে রেখেছে। গরম জামা কাপড়ের ওপর দুটো কম্বল চাপিয়ে আমরা বাইরের ঘরে এলাম।

একটি নাটকের পর্দা উঠছে, দর্শকরা উদগ্রীব, এইভাবে বসে আছি। হঠাৎ ঘুটঘুটে অন্ধকারের গায়ে একটা লাল বল ফুটে উঠল। তারপর বলটা গড়িয়ে যেতে লাগল। যেন আলো তাড়া করছে অন্ধকারকে। এমন দৃশ্য কোনদিন দেখিনি। একটু পরেই পাতলা হয়ে এল অন্ধকার। আলোর রঙ পাল্টে যাচ্ছে ঘনঘন আর তারপরেই যেন লাল টোপর পরা ভদ্রমহিলা লজ্জায় মুখ তুললেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা। ক্রমশ তার সখীরা ছোটবড় মাথা তুলে পাশাপাশি দাঁড়াল। আরও দূরে পৌরুষ নিয়ে এভারেস্ট। ওদের গায়ের বরফ স্পষ্ট দেখছি, বুঝি হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যায়।

আঠাশ হাজার একশ ছেচল্লিশ ফুট উঁচু পাহাড়টার আদি নাম কিংসুম জায়োঙবু চু পবিত্র উজ্জ্বল কপাল। প্রথম এবং শেষ সূর্যের কিরণে ওর চূড়াকে লাল এবং সোনালি দেখায়। লেপচাদের কাছে এই পর্বত দেবতার মত। কারণ তারা বিশ্বাস করে তাদের প্রথম পূর্বপুরুষকে ঈশ্বর ওই পবিত্র চুড়োর বরফ দিয়ে তৈরী করেছিল। পরে তিব্বতীরা এখানে এসে চুড়োর নাম রাখল খাঞ্চেন জোঙ্গা। অর্থ মহান বরফের শিখর। সিকিমিজ এবং ভুটিয়ারা একে মনে

করে কুবের, সম্পদের দেবতা। ইংরেজরা এসে ওই তিব্বতী নামকে সহজ করল, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পবিত্রের মধ্যে পবিত্রতম।

সান্দাকফুতে ট্রেকারদের জন্যে ভি আই বাংলো আছে, ইয়ুথ হোস্টেল আছে। মানুষের বাসযোগ্য নয় সেগুলো। হু-হু করে হিমবাতাস ঢোকে সেখানে। এত বিজ্ঞাপন ছাপেন ট্যুরিস্টব্যুরো কিন্তু অযত্নে অবহেলায় এই আবাসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একজন ট্রেকারকে বেড়াতে যাওয়ার লোভ দেখান, কিন্তু তার জন্যে সামান্য আরামের ব্যবস্থা নেই। পি ডবলু ডি বাংলো সাধারণের জন্যে নয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই জায়গাটিতে ওরা নজর দিতে পারেন না। খাবার নেই, জল আনতে হয় বহুদূর থেকে বয়ে, কেউ অসুস্থ হলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, পথে, দীর্ঘপথে প্রাকৃতিক তুর্যোগ থেকে বাঁচবার জন্য কোন আচ্ছাদন নেই—কি অবহেলায় নষ্ট করছি এই ট্যুরিস্টদের স্বর্গটিকে। তবু মানুষ যায়, প্রচুর বিদেশীকে দেখেছি তুদিনে। একটু দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলে তো আখেরে আমাদেরই লাভ।

থাকার জায়গা নেই জেনে বাধ্য হলাম রুট পালটাতে। তুদিন ওখানে কাটিয়ে নেমে এলাম বিকেভঞ্জঙ্গে। আশ্চর্য, নামতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু পিছু ফিরে তাকাতেই চমকে উঠছিলাম! ওই অত ওপরে আমরা উঠেছিলাম! গভীর জঙ্গলের পথে রাম সিং আমাদের নিয়ে এল। তুধারে বিশাল গাছ, তাতে নানান রঙের ফুল, কতরকমের পাখি ডেকে যাচ্ছে। রাম সিং আশ্বস্ত করল একমাত্র ভাল্লুক ছাড়া আর কেউ ভয় দেখাবে না এবং এ ব্যাপারে তারা খুব ভদ্রলোক। শুধু নামছি আর নামছি। ক্রমশ থাই এবং টো বিদ্রোহ শুরু করল। বিশাল জঙ্গলে আমরা ছাড়া কোন প্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছে না। বিকেল তিনটে নাগাদ জঙ্গল ফুঁড়ে একটা ঝকঝকে ফরেস্ট বাংলো বেরিয়ে এল। রিম্বিক। সাত হাজার পাচশো ফুট।

জঙ্গলের ঘ্রাণ বুক ভরে নেওয়া আর তুম্বা খাওয়া—রিম্বিকের

সবচেয়ে বড় আরাম। কাঠের চোঙার মধ্যে একধরনের সরষে জাতীয় দানায় গরম জলে ভিজিয়ে কাঠের স্ট্র দিয়ে টানলে মুহূর্তেই শরীর গরম। এত ভাল পানীয় আমি কখনই খাইনি। রোজ দুবার খেলে শরীর ফিরতে বাধ্য, নেশা হয় ঢুলুঢুলু, চমৎকার।

রিম্বিকের নিচে গুম্বাডারা হয়ে ইনটেকে নেমে এলে বাস পাওয়া যায়। ভোর সাড়ে ছ'টায় ছাড়ে। সোজা দার্জিলিং-এ পৌঁছায় সাড়ে দশটায়। ফিরে আসতে আসতে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখলাম, হাড়ের মত ফ্যাকাশে। মানেভঞ্জঙ্গ-এ বাস থামল। নমস্কার করে নেমে গেল রাম সিং। এই কদিনে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। জানলা দিয়ে দেখলাম যেতে যেতে রাম সিং তিনজন ট্রেকারের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সে ঘাড় নাড়ল। ট্রেকারেরা তাদের মাল তুলে দিল রাম সিং এর কাঁধে। বাড়ি না ফিরে আবার রাম সিং বোঝা নিয়ে হাঁটা শুরু করল সান্দাকফুর পথে। কোন বিকার নেই, আগামী কয়েকটা দিনে পঁচিশ টাকার আশ্বাস অনেক বড় ওর কাছে।

প্রতিবন্ধী

ওকে প্রথম দেখেছিল রাহুল। যেদিন পায়ে বেশি ব্যথা লাগে, সেদিন দোতালার ব্যালকনিতে চুপচাপ ক্রাচ পায়ে রেখে বসে থাকে সে। ডক্টর সোমের সেইরকমই নির্দেশ।

তখন সকালবেলা। পড়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। হোমের ছেলেমেয়েরা রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ব্যালকনিতে বসে ছিল রুনা। রুনা চোখে দেখতে পায় না। রাহুলের সঙ্গে ওর খুব ভাব।

ডক্টর সোমের এই হোমে পাঁচরকমের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমে সাহায্য করা হয়। ডক্টর সোম প্রায়ই বলেন, 'তোমরা কতটা অক্ষম, সেটার হিসেব না-করে কতটা সক্ষম সেইটে জানতে হবে। প্রতিটি দিন যাতে সেই জানাটা এক জায়গায় থেমে না থাকে, তার চেষ্টা করা মানে বেঁচে থাকা।'

এই হোমে আসার আগে রাহুলের মতো রুনাও ভাবতে পারেনি, তাদের সামনে একটা সুন্দর জীবনের ইঙ্গিত আছে। পাবলো বলে একটা বাচ্চাকে ওর বাবা-মা এখানে রেখে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। পাবলো না পারত কথা বলতে, না সে কানে শুনত। ছোট্ট একটা অপারেশনের পর ডক্টর সোম আর সুপ্রিয়াদিদি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবলোকে 'মা' বলতে শিখিয়েছেন। পোলিওতে রাহুলের একটা পা অকেজো হয়ে গেছে। যে হাতটা দিয়ে সে মাউথঅর্গান বাজায়, সেটাকে কোনওমতে সে মুখ পর্যন্ত তুলতে পারে।

দেখতে পেয়ে রাহুল অবাক হয়ে বলেছিল, "এই দ্যাখ কে ঢুকছে হোমে!"

রুনার চোখে কালো চশমা, "আমি কী করে দেখব ?"

রাহুল জিভ কাটল। তারপর সাত বছরের রুনার কাঁধে হাত রেখে বলল, "একটা বিরাট লম্বা কালো মানুষ। 'টমকাকার কুটির' বলে একটা বই আছে, সেই টমকাকার মতো।"

রুনার কপালে ভাঁজ পড়ল। "সেই যে লোকটা, যাকে মনিব চাবুক মারত, সে এসেছে ?"

"দূর! সে তো বইয়ে আছে। এ অন্য লোক। ওইরকম দেখতে।"

ডক্টর সোম চিঠিটা পড়লেন। পাকা চুলে হাত বোলানো তাঁর অভ্যাস। বললেন, "আপনি এতদিন পুরুলিয়ার ইণ্টারন্যাশনাল হোম ফর অর্ফান-এ কাজ করেছেন। ফাদার লিখেছেন, দেশে ফিরে যাওয়ার আগে আপনি কয়েকদিন প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাতে চান! কিন্তু কেন ?"

লোকটির চেহারা বিশাল। গায়ের রঙে কালো বিদ্যুৎ যেন ঠিকরে ওঠে নড়াচড়া করলেই। মাথায় জমে-যাওয়া কোঁকড়া চুল। একটা ব্যাগ আর গিটারের বাক্স পাশে রাখা। লুথার হাসল, "ওয়েল ডক্টর, আমি এতদিন যে-সব বাচ্চাদের দেখেছি, তারা সামাজিক প্রতিবন্ধী। ঈশ্বর কিংবা মানুষের অবহেলা যাদের শারীরিক প্রতিবন্ধী করে রেখেছে, তাদের একটু কাছ থেকে জানতে চাই। সাত দিন থাকব এখানে, আমার দ্বারা যে-কাজ হবে বলে মনে করবেন, তাই করে দেব।"

ডক্টর সোম হাসলেন, "কিছু মনে করবেন না। আমরা ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা দিই, যাতে তারা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারে। সে-ব্যাপারে আপনি কোনও সাহায্য করতে পারবেন না। কিন্তু ফাদার লিখেছেন, আপনি চমৎকার গিটার বাজিয়ে গান গাইতে পারেন। আপনি বাচ্চাদের ভাল লাগার গান গাইতে জানেন ?"

লুথার মাথা নাড়ল। "আমি চেষ্টা করি গান গাইতে, কখনও-

কখনও যখন ছেলে-বুড়ো সবার ভাল লাগে, তখন বুঝি, গানটা হল।"

কথাটার মানে ধরতে পেরে হেসে উঠলেন ডক্টর সোম। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, "গুড। আমাদের একটা গেস্টরুম আছে। সেখানেই থাকবেন। অ্যাদ্দিন যখন পুরুলিয়ায় ছিলেন, তখন আমাদের খাবারে নিশ্চয়ই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আপনি যদি ওদের উদ্দীপ্ত করার গান শিখিয়ে দেন, কয়েকদিনে, খুশি হব। আসুন আমার সঙ্গে।"

লুথারকে নিয়ে ডক্টর সোম তাঁর অফিস থেকে বেরিয়েই সুপ্রিয়াকে দেখতে পেলেন। সুপ্রিয়া অমলের হুইলচেয়ার ঠেলতে-ঠেলতে আসছিল গল্প করতে করতে। ডক্টর সোম ডাকলেন, সুপ্রিয়া, এদিকে এসো। ইনি লুথার। আমেরিকার ছেলে। পুরুলিয়ায় ফাদার ডিমকের হোমে ছিলেন। সাতদিন এখানে থেকে সবাইকে গান শোনাবেন।"

একজন নিগ্রোকে দেখে সুপ্রিয়া বিস্মিত হয়েছিল। বস্তুত এই প্রথমবার সে সামনাসামনি কোনও নিগ্রোকে দেখতে পেল। কাঁপা গলায় বলল, "নমস্কার।"

মাথা ঝাঁকাল লুথার। তারপর এগিয়ে গিয়ে পা মুড়ে নিলডাউন হল অমলের পাশে। "আমার নাম লুথার। তুমি ?

অত বিশাল একটা কালো মানুষকে তার কাছে এগিয়ে আসতে দেখে অমলের বুক ঢিপঢিপ করছিল। সে পেছন দিকে সিঁটিয়ে বসে রইল। ডক্টর সোম বললেন, "কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হয়, অমল। নামটা বলো।"

আর সেইসময় লুথার হাসল। তার কালো মুখে মুক্তোর ছটা ছড়াল। অমলের মুখে নামটা শুনতে পেয়ে কয়েকবার শব্দটা নাড়াচাড়া করল লুথার, "ওমোল, ওমোল।"

নিজের নামটার অমন উচ্চারণ শুনে হাসি পেয়ে গেল অমলের। কিন্তু তখন লুথার বলল, "নাউ, ওমোল, উই আর ফ্রেণ্ডস। ডক্টর,

আমি যদি অমলের সঙ্গে বেড়াতে যাই, আপত্তি আছে আপনার? ওমোল ক্যান ইন্ট্রোডিউস মি টু আদার্স।"

ডক্টর সোম বললেন, "নো আপত্তি।"

লুথার স্যুটকেসটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে গিটারের বাক্সটার স্ট্র্যাপ বন্দুকের মতো কাঁধে ঝুলিয়ে হুইলচেয়ার সন্তর্পণে ঠেলতে লাগল। ওরা দৃষ্টির বাইরে যাওয়া মাত্র সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী ডক্টর? লোকটা কে?"

ডক্টর সোম বললেন, "ওর নাম লুথার। আমেরিকান। আন্তর্জাতিক অনাথ আশ্রমের ভলান্টিয়ার। এরকম মানুষ পৃথিবীতে আছে বলেই মানুষের নিশ্বাস এখনও স্বাভাবিক। তুমি ভেবে দ্যাখো সুপ্রিয়া, ওর পূর্বপুরুষকে ক্রীতদাস করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হয়তো একদিন আমেরিকায়। অনেক বেত পড়েছে ওর পূর্বপুরুষের পিঠে। আর আজ ও পৃথিবীর অনাথদের সেবা করে চলেছে স্বার্থহীন ভাবে দেশে-দেশে ঘুরে। ফেরার আগে লুথার আমাদের সঙ্গে ক'দিন থাকতে চায়। তুমি দেখো, ছেলেমেয়েরা যেন ওর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মেশে।"

লুথার হুইলচেয়ার ঠেলছিল। অমল সিটিয়ে বসে ছিল। ওর খুব ভয় করছিল। রাহুলের চেয়েও অমলের অবস্থা খারাপ। সে নিজের পায়ে উঠেও দাঁড়াতে পারে না। ওর দুটো পা'ই অকেজো হয়ে গেছে। কিন্তু হোমে আসার পর তাব মনমরা ভাবটা অনেক কম। হঠাৎ লুথার দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কানে মাউথঅর্গানের সুর এসেছে। মুখ তুলে চারপাশে দেখে লুথার জিজ্ঞেস করল, "কে বাজাচ্ছে ওমোল?"

"রাহুল," অমল শুকনো গলায় উত্তর দিল।

"বিউটিফুল," লুথার মাথা নাড়ল, "তুমি পারো না?"

"না। আমি ছবি আঁকতে পারি।"

"খুব ভাল। গান?

"না। আমি তো কখনও গান শিখিনি।"

"ঠিক আছে, আমি তোমাকে গান শিখিয়ে দেব।"

"আমার গলায় গান হবে?"

"কেন হবে না? যত খারাপ হোক গলা, যদি বুকের ভেতর থেকে গাইতে পারো, তা হলে সেটা গান হবেই। এখানে তোমরা যারা আছ, তাদের অসুবিধে কী?"

অমলের ততক্ষণে মনে হয়েছে, এই মানুষটার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। একে দেখতে পরিচিতদের মতো নয়। সাহেবদের যে চেহারা সে ছবিতে দেখেছে, তার সঙ্গেও মিল নেই। গায়ের রং এত কালো কী করে হয়? তবু তার কথা বলতে সঙ্কোচ হল না এখন। "আমি হাঁটতে পারি না, ওমর, রুনা চোখে দেখতে পায় না। কয়েকজন আছে, যারা কানেও শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না। আবার কারও শরীরটা একটুও বড় হয়নি, মানে বাড়েনি, কিন্তু বুদ্ধি খুব পরিস্কার। আবার কেউ-কেউ স্বাভাবিক লোকের মতো বড় হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।

খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল হোমে। নইলে দিদিদের কথা উপেক্ষা করেও সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে কেন? দৃশ্যটা দেখে লুথার থমকে গেল। এত ছেলেমেয়ে, যাদের কারও বয়সই পনেরোর উপরে নয়, প্রতিবন্ধী! সে মাউথঅর্গান হাতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল, "তুমি রাহুল?"

রাহুল হতবাক। সে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ক্রাচে ভর করে। অবাক হয়ে রুনার দিকে তাকাল সে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, "এ কী রে! আমার নাম জানে!"

রুনা চশমা চোখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করে জানলে?"

লুথার হাসল, "আমি জানি। যারা সুর বাজায়, তারা আমার বন্ধু।"

অমল বলল, "তা হলে তখন তুমি আমাকে বন্ধু বললে কেন? আমি তো সুর বাজাতে পারি না।"

লুথার মাথা নাড়ল, "ঠিক, ঠিক। তবে সুর কি কেবল যন্ত্রে কিংবা গলায় বাজে? সুর বাজে আকাশে, বাতাসে, ঘাসে গাছের পাতায়, এমনকী, মানুষের হাসিতে। যে পরিষ্কার হাসতে পারে, সে কেন বন্ধু হবে না?"

লুথার যুক্তি দিল বটে, কিন্তু অমলের মন খারাপই থেকে গেল। রাহুল একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এমন বাংলা বলো কী করে?"

"আমি তো অনেকদিন আছি পুরুলিয়ায়। তবু আমার বাংলা ভাল না।"

"তোমার পিঠে ওটা কী?"

"এইটা?" স্ট্র্যাপটা হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাক্স খুলল লুথার, "এটা আমার গিটার। আমি একে কখনও হাতছাড়া করি না। এ-ও সুর বাজায়, তাই আমার বন্ধু।"

রুনা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। লুথারের আকৃতি কিংবা রং সে দেখতে পাচ্ছে না। সে মনে জিজ্ঞেস করল, "তুমি গিটার বাজাতে পারো?

"একটু একটু। তোমরা শুনবে?"

রুনা একাই ঘাড় কাত করে টেনে হ্যাঁ বলল। চোখ বন্ধ করে গিটারের তারে আঙ্গুল বোলাল লুথার। সঙ্গে-সঙ্গে সুর ছিটকে উঠল বাতাসে। যারা দূরে কিংবা আড়ালে ছিল, তারাই এগিয়ে এল। যারা চোখে দেখতে পায়, তাদের আতঙ্কটা বেশি ছিল। লুথারের চেহারার মানুষের সঙ্গে যেহেতু ওদের কখনই পরিচয় ছিল না, তাই আতঙ্ক। কিন্তু যারা চোখে দেখতে পায় না, যেমন রুনা কিংবা ওমর, সুর শোনামাত্র গুটিগুটি তারা এগিয়ে এল লুথারের পাশে। সুর মনে-মনে স্থির করে নিয়ে লুথার চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় গাইল,

গুড মর্নিং হোয়েন ইট্'স মর্নিং,
গুড মর্নিং টু দি সানসাইন,

গুড ডে হোয়েন ইট্'স লাইট,
গুড লাইট হোয়েন ইট'স নাইট ;
অ্যাণ্ড হোয়েন ইট'স টাইম টু গো অ্যাওয়ে,
গুড বাই—গুড বাই— গুড বাই।

যারা কথা বুঝল, তারা চমকিত হল। যারা বুঝল না, তারা সুরের নড়াচড়ায় দুলে উঠল। একই লাইন নানান সুরে গাইছে লুথার। হঠাৎ ভিন্ন বাজনা কানে আসতেই সে চোখ খুলে দেখল, রাহুল তার সুরে সুর মেলাচ্ছে মাউথঅর্গানে। সে গাইতে-গাইতে একটা হাতের মুঠোয় উৎসাহ প্রকাশ করল।

•

চব্বিশ ঘণ্টা কাটল না, লুথার ডক্টর সোমের হোমের ছেলে-মেয়েদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মানসিক জড়বুদ্ধি- সম্পন্ন আর অন্ধদের খুব বন্ধু হয়ে গেল সে। ওর গিটারের ঠেলায় হোমের সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা বানচাল হওয়ার উপক্রম। কিন্তু ডক্টর সোম কোনও বাধা দিলেন না।

"নো বয়েজ, ইউ মাস্ট প্লে। পা নেই তো ঠিক হ্যায়, যে খেলা খেলতে পা লাগে না সেই খেলা খেলবে। নাউ টেল মি, কোন্ খেলায় পা লাগে না?"

একজন চেঁচিয়ে উঠল, "লুডো।"

কেউ বলল, "ক্যারম আর তাস।"

"ইয়েস, ইয়েস, সবাই ঠিক বলেছে, কিন্তু যে-খেলা এখন সমস্ত পৃথিবীতে জনপ্রিয়, সেই খেলাটার নাম হল চেস, দাবা। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? বুদ্ধিমানদের খেলা। যত খেলবে তত তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে।"

মানসিক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন একজনকে দেখিয়ে রাহুল বলল, "ও তো চিন্তা করতেই পারে না। ও কী করে খেলবে?"

"ও দৌড়বে, আর গান গাইবে। তুমি এদিকে এসো। কাম।"

যাকে ডাকল লুথার, তার মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই। শুধু

সকালবেলায় বাথরুমের পর্ব মিটে যাওয়ার পর থেকে ওর মুখে যে হাসি সেঁটে যায়, তা রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মোছে না। বছর পনেরোর লম্বা শিশির এগিয়ে এল ইতস্তত করতে করতে, লুথার দৌড়ে তার হাত ধরে সবার সামনে নিয়ে এল। তারপর গিটারটা তুলে সুর ধরতেই শিশির মাথা নাড়ল খুশিতে। লুথার ঝুঁকে শিশিরের বুকে একটা আঙুল রেখে বলল, "তোমাকেও গাইতে হবে আমার সঙ্গে।"

সুর বন্ধ হওয়ায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল শিশিরের। লুথার আবার বলল, "গান গাইতে হবে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? গা—ন।"

শিশির এবার মাথা নাড়ল।

লুথার গাইল,

দি লাভ ইন ইওর হার্ট
ওয়াজ'ন্ট পুট দেয়ার টু স্টে
লাভ ইজ'ন্ট লাভ
টিল ইটস গিভন অ্যাওয়ে।

বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় শিশির প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে গানটা গাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু আস্তে-আস্তে যখন মাঠের মাঝখানে দাঁড়ানো বা হুইলচেয়ারে বসা বাচ্চারাই গলা মেলাল, তখন সে সরব হল। নাচের ভঙ্গিতে বাচ্চাদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে গান গাইছিল লুথার গিটার বাজিয়ে। বাচ্চারাও জোর আনন্দ পেয়ে গেছে তখন। সুর স্থির থাকছে না, কিন্তু আবেগটা চিৎকারের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল।

ক্রমশ মিশে গেল লুথার। রুনা যখন তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কাবুলিওয়ালার গল্প জানো? তখন মাথা নেড়ে 'না' বলে সে।

রুনা বলে, "তুমি মুখ দিয়ে জবাব দেবে, কেমন?"

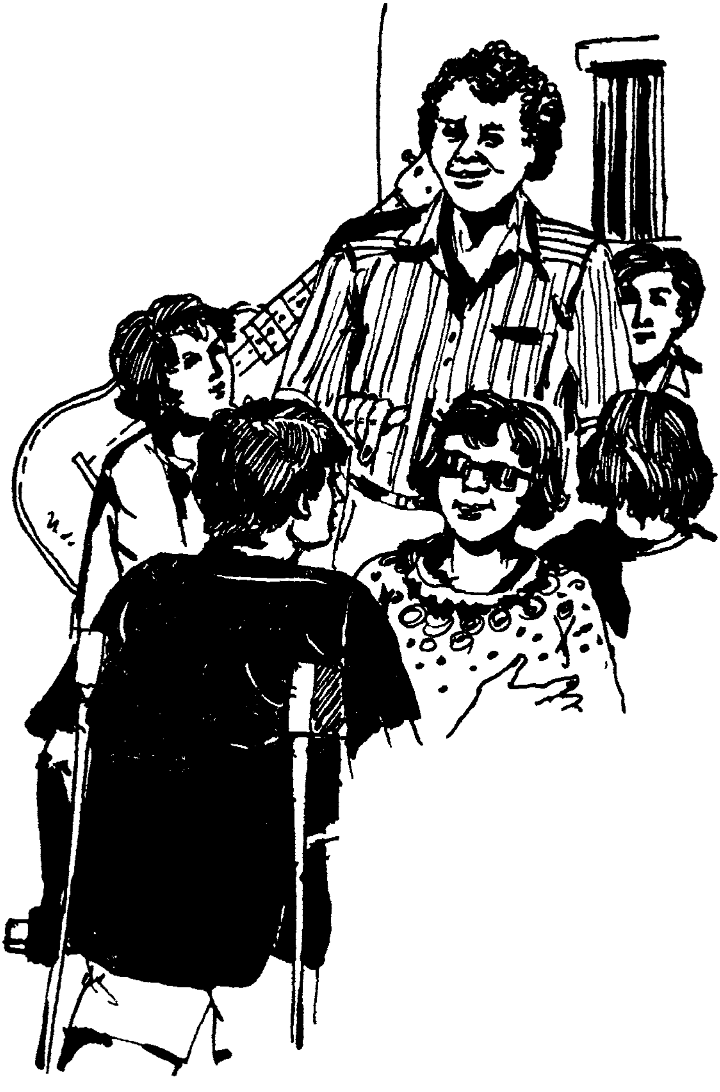

লজ্জিত হয় লুথার, "আই অ্যাম সরি। মুখ তো ঈশ্বর দিয়েছেন কথা বলার জন্যে। আমি যে কেন ছাই সেটার ব্যবহার করতে পারি না সবসময়।"

রাহুল জিজ্ঞেস করল, "তুমি 'আঙ্কল টম'স কেবিন' পড়েছ?"

"হু ইজ আঙ্কল টম?"

রাহুল আর রুনা হাততালি দিয়ে উঠল, “এ মা, তুমি কিচ্ছু জানো না! আঙ্কল টম তোমার মতো দেখতে, আর তার গল্প পড়োনি?

“আমার মতো দেখতে গল্পটা বলবে?”

রাহুল গল্পটা শুরু করল। সবাই ঘন হয়ে বসল। গল্প শেষ হতে সবাই লুথারের চোখে জল দেখতে পেল। অমল জিজ্ঞেস করল, “তুমি কাঁদছ? টমকাকার জন্যে কষ্ট হচ্ছে?”

লুথার মাথা নাড়ল, “না। টমকাকার গল্প এত দূরে বসেও তোমরা এমন ভাবে করছ বলে আনন্দ হচ্ছে।”

রুনা জিজ্ঞেস করল, “আনন্দে কেউ কাঁদে নাকি?”

“হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বের হয় না?” অমল জানিয়ে দিল।

লুথার হাতের পাতায় মুখ ঘষে জল সরিয়ে দিল, “ইড মাস্ট ওভারকাম। তোমাদের মতো ভাল ছেলেমেয়েরা কখনওই সারেণ্ডার করবে না। খুব কষ্ট হবে, কিন্তু একটা দিন আসবেই, সেদিন তোমরা সুস্থ মানুষের চেয়ে কম কাজ করতে পারবে না। খুব কষ্ট করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, যাতে হাত, পা, চোখ, কিংবা বুদ্ধির অভাবগুলো দূর হয়ে যায়। তোমরা কিছুতেই প্রতিবন্ধী নও।”

এই সময় সুপ্রিয়াকে দেখা যায় এগিয়ে আসতে, “মিষ্টার লুথার আপনাকে ডক্টর সোম ডাকছেন।”

“ডোণ্ট কল মি মিস্টার, আমি শুধু লুথার। ওয়েল ফ্রেণ্ডস, তোমরা কথা বলো, আমি আসছি।”

ডক্টর সোম গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। তাঁর সামনে ফাদার ডিমকের একটা চিঠি খোলা। কিন্তু চিঠির দিকে নজর ছিল না তাঁর। হঠাৎ দরজা থেকে চিৎকার ভেসে এল, “হাই ডক্। আপনি আমাকে ডেকেছেন? একটা চমৎকার গল্প শুনছিলাম রাহুলের কাছে। জানেন, এই ছেলেমেয়েদের কেউ কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতা দূর করবেই।”

"থ্যাঙ্কস। বোসো।" ডক্টর সোম চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

"হোয়াটস দ্য ম্যাটার?" চেয়ার টেনে নিয়ে প্রশ্ন করল লুথার।

"ফাদার ডিমক চিঠি দিয়েছেন। তিনি তোমাকে এখনই আমেরিকায় যেতে বলেছেন।"

"কেন? আমার তো এখানে কিছুদিন থাকার কথা।"

"ছিল।"

"কেন, আমি কি কোনও অসুবিধে করছি আপনার?"

"নো নো, নট অ্যাট অল্। ফাদার ডিমক লিখেছেন, তুমি মাঝে-মাঝেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছ। পুরুলিয়ার কোনও ডাক্তার রোগটা ধরতে পারছে না। অসুখটার চিকিৎসার জন্যে তোমার এখনই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত।"

ঠোঁট কামড়াল লুথার, "আই অ্যাম অল রাইট। দশ-পনেরো দিনে কিছু হবে না।"

"নো, ইউ আর নট," ডাক্তার সোম উত্তেজিত হলেন।

"ওয়েল, ডু ইউ থিংক আই অ্যাম ক্যারিয়িং সাম ইনফেকশাস ডিজিজ?"

"নো। সার্টেনলি নট। আমি তোমার জন্যেই বলছি। ইউ মাস্ট গো ব্যাক টু-মরো। তোমার টিকিট পাশপোর্ট আমাকে দাও। আমার একটি পরিচিত ট্রাভ্‌ল এজেন্টকে দিয়ে কালকের টিকিট করিয়ে নিচ্ছি।"

সেই রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটল। হুইলচেয়ার থেকে বিছানায় নিজে-নিজে উঠতে গিয়েছিল অমল। সেই সময় ব্যালেন্স হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। মাথার পাশে এমন আঘাত লাগে যে, সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সিস্টার ওদের ডিউটিতে ছিলেন, তিনি জানান, অমল কিছুতেই তার কথামতো একটু অপেক্ষা করেনি। অন্য একটি ছেলেকে তিনি যখন সাহায্য করছিলেন, তখন অমল উৎসাহটা দেখায়। পড়ে যাচ্ছে

দেখে ছুটে এসেও তিনি কিছু করতে পারেননি। অমলের বাবা-মা থাকেন শহরের এক প্রান্তে। খবর পেয়ে তাঁরাও ছুটে এসেছেন। ডক্টর সোম বিব্রত এবং চিন্তিত হয়ে পায়চারি করছেন বাইরে। সুপ্রিয়াকে হোমের দায়িত্বে রেখে তিনি এসেছেন। এরকম ঘটনার পেছনে যা-ই কারণ না থাক না কেন, এটা তার হোমের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা হিসেবেই প্রচারিত হবে। এবং তিনি দায়িত্ব অস্বীকার করছেনও না। অমলকে যারা পরীক্ষা করছিলেন, তাঁদের একজন সিনিয়ার ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে। কানের ওপরে স্কালে সামান্য চোট লেগেছে। এক্স-র রিপোর্ট তা-ই বলছে। রাতটা দেখব। দরকার হলে সকালে অপারেশন করতে হবে।"

অমলের বাবা বললেন, "ও আমার একমাত্র সন্তান। যেমন করেই হোক…"

হসপিটালের ডাক্তার বললেন, "চিন্তা করবেন না। শুধু দু'বোতল রক্ত তৈরি রাখুন ওর ব্লাড গ্রুপ একটু বাদেই বলে দিচ্ছি।"

অমলের বাবা মাথা নাড়লেন, "ওর আর আমার একই ব্লাড গ্রুপ। কিছুদিন আগে আমরা করিয়েছিলাম।"

ডাক্তার হাসলেন, "নট দ্যাট। আমাদের স্টক থেকে আমরা রক্ত দেব। শুধু আপনারা যে-কোনও গ্রুপের ব্লাড দিয়ে ওটাকে রিপ্লেস করে দেবেন।"

দূরে দাঁড়িয়ে শরীর কুঁকড়ে শুনছিল লুথার। এবার এগিয়ে এসে বলল, "ডক্টর, আমি রক্ত দিচ্ছি, এখনই নিয়ে নিন। আমি কাল চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার রক্ত এখানে থাক।"

ডক্টর সোম দ্রুত মাথা নাড়লেন, "নো। তা হয় না।"

"কেন হয় না? ওই ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি রক্ত দিতে পারি না?"

"পারো না। তুমি পারো না," ডক্টর সোম মাথা নাড়লেন।

"কিন্তু কেন? আমার অপরাধ কী?"

"জাস্ট ডোণ্ট আস্ক মি। আমি বলতে পারব না।"

হোমে ফিরে এসে ঘুমোতে পারছিলেন না ডক্টর সোম। তাঁর হোমের কোনও ছেলের এমন দুর্ঘটনা কখনও ঘটেনি। কাল সকালে যদি অমল সুস্থ না হয়? তিনি জানালা দিয়ে অন্ধকারের আকাশ দেখছিলেন। এবং তখনই নজর গেল অফিসের দিকে। শোবার ঘর থেকে যে জানলাটা দেখা যায়, সেখানে আলো পড়ছে অথচ তিনি ঘরের আলো নিভিয়ে এসেছিলেন। ডক্টর সোম নিঃশব্দে নেমে এলেন।

তাঁর অফিসঘরের দরজাটা ভেজানো। ধীরে-ধীরে চাপ দিতেই খুলে গেল। তিনি দেখলেন, একটা ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে লুথার। ফাইলটাতেই তিনি ফাদার ডিমকের চিঠি রেখেছেন। চিঠিটা খুঁজে পেয়ে দ্রুত পড়ে ফেলছিল লুথার তারপর চিৎকার করে উঠল, "ও মাই গড!" ধপ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে। বসে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। ডক্টর সোম একটু ইতস্তত করে দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে চললেন শোওয়ার ঘরের দিকে।

বিকেলে চলে যাবে লুথার। একটু আগে খবর এসেছে, অমলের বিপদ কেটে গেছে। সে ভাল হয়ে উঠবে কিছুদিনের মধ্যেই। হোমের সমস্ত ছেলেমেয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ডক্টর সোম লুথারকে তার ঘর থেকে নিয়ে এলেন। লুথারের এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে গিটারের বাক্স। সুপ্রিয়া ছেলেমেয়েদের বোঝাচ্ছিল কী করতে হবে। ওদের দেখে কথা বন্ধ করল। হঠাৎ লুথার ডক্টর সোমকে বলল, "থ্যাঙ্কস, ডক্টর। কাল আমাকে রক্ত দিতে নিষেধ করে ভাল করেছেন। এই রক্ত কোনও সুস্থ মানুষকে দেওয়া যায় না।"

ডক্টর সোম বললেন, "আমেরিকায় এখন তো এর ট্রিটমেণ্ট..."

"ইউজলেস," বাধা দিল লুথার, "লিউকোমিয়া যখন প্রমাণিত,

তখন আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে। ফাদার ডিমকের চিঠি কাল রাত্রে দেখেছি আমি, আপনাকে না জানিয়ে। আমার ব্লাড রিপোর্টের কথা ফাদার আমাকে জানাননি। কিন্তু জেনে গেলাম মাই ডেজ আর লিমিটেড। বাট নট দেয়ার্স। হেল্প দেম।"

লুথার যখন ওদের সামনে এল, তখন সবক'টি গলা মাউথ-অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠল, "গুড মর্নিং হোয়েন ইট'স মর্নিং, গুড নাইট হোয়েন ইট'স নাইট অ্যাণ্ড হোয়েন ইট'স টাইম টু গো অ্যাওয়ে, গুডবাই-গুডবাই-গুডবাই।"

হঠাৎ লুথার চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই সবাই থেমে গেল। ওরা অবাক হয়ে দেখল, পিঠ থেকে গিটারের বাক্সটা খুলে নিয়ে লুথার রাহুলের হাতে ধরিয়ে দিল, "ইট'স মিউজিক, আমার অনুরোধ নেভার সে গুডবাই টু ইট, ও কে?"

তারপর ধীরে-ধীরে গেটের বাইরে অপেক্ষারত ট্যাক্সির দিকে পা বাড়াল লুথার।

ভগবানের ভাইবোন

১

এতখানি আকাশ একসঙ্গে দেখলে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। নীল, কিংবা নীলের মিশেল দেওয়া শূন্য পৃথিবীটাকে মশারির মত ঢেকে রেখেছে। কিছুক্ষণ তাকালে কেমন যেন হয়ে যায় মন। মনে হয় ঝাঁপ দিই ওখানে, শূন্যের শেষটা দেখে আসি। শহরের এ দিকটায় গাছপালা নেই। তার ওপরে জমি ঢালু হতে হতে এত নিচে নেমে গেছে যে মনে হয় সত্যি পৃথিবীটা গোল এবং সেটা এখানে দাঁড়ালেই প্রমাণ করা যাবে। ঠিক গ্লোবের মত দেখতে।

এই জায়গাটা শহর ছাড়িয়ে। ব্যানার্জি পাড়ার পরেই সার্কাসের মাঠ। বছরে একবার সার্কাস আসে কি আসে না কিন্তু ওই নাম হয়ে আছে। সেই মাঠ ছাড়ালেই শুধু খালি জমি আর জমি। এখানে চাষবাস হওয়া দূরের কথা কিছু আগাছা ছাড়া গাছপালা ভাল করে জন্মাতে চায় না। শহরের ঐ দিকটা সত্যি পরিত্যক্ত, লোকজন বড় একটা আসে না। এমনকি গরু, ভেড়া চরাতে রাখালরা পছন্দ করে শহরের উলটো দিকটা যেখানে সবুজ ঘাসের ছড়াছড়ি। দুপুর পেরোলেই একটা শনশনে হাওয়া বয় এখানে। শহরের বুড়োবুড়িরা বলে থাকেন, ওই হাওয়া নাকি নিশ্বাসের মত গরম। পৃথিবীর বুক থেকে উঠে আসে। ওর ছোঁওয়া লাগলে নাকি শরীর খারাপ হতে বাধ্য। বোধহয় এই

গল্পের জন্যেই অনেকে এদিকে আসে না। তাছাড়া খামোকা এরকম খাঁখাঁ জায়গায় এসে মানুষ কী করবে। তাই সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়ে তখন এই জায়গাটা একদম ফাঁকা। মাইলের পর মাইল চুপচাপ পড়ে থাকে। রাত হলে তো কথাই নেই।

কিন্তু একদম মনুষ্যবসতিহীন বললে সামান্য অসত্য থেকে যাবে। এই শহরের বিস্ময়টাও এখানেই। সার্কাসের মাঠের গা ঘেঁষে হাইওয়ে চলে গিয়েছে পরের শহরের দিকে, ওই বিস্তীর্ণ খরখরে জায়গাটাকে পাশে রেখে। দিনরাত গাড়ি যাওয়া-আসা করে সেই রাস্তায়। আর নতুন মানুষ যারা ওই রাস্তায় বাসে চেপে শহরে আসে তারা অবাক হয়ে দেখে আচমকা একটা পাঁচিলে ঘেরা দোতলা বাড়ি দরজা-জানলা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। অন্তত মাইল খানেক যাওয়ার পর যদিও সার্কাসের মাঠ তবে তার পেছনে ধুধু বুনো ঝোপের প্রান্তর। এইরকম জায়গায় কোন মানুষ কী প্রয়োজনে বাড়ি তৈরি করবেন তা বোঝা মুস্কিল। শহরের লোকজনও হাইওয়ে দিয়ে যাওয়া-আসার পথে যখন বাড়িটাকে দেখত তখন অস্বস্তিতে পড়ত। পাঁচিলে ঘেরা বলে বাড়ির ভেতরটায় কিছু দেখা যায় না হাইওয়ে থেকে, লোহার গেটে প্রায়ই তালা দেওয়া থাকে। যখন থাকে না তখন বোঝা যায় যিনি এসেছেন তাঁর গাড়ি আছে। কারণ গেটের ফাঁক দিয়ে শুধু গ্যারেজের মুখটুকুই চোখে পড়ে।

ওই দোতলা বাড়ির মালিক কলকাতায় থাকেন। বয়স হয়েছে। মাসে এক-আধবার এখানে বিশ্রামের জন্যে আসেন। একা থাকতে ভালবাসেন এবং শহরের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না। মোটামুটি এইরকম তথ্য ওঁর সম্পর্কে প্রচারিত। পুলিশও এর বেশি কিছু জানতে চায়নি, কারণ ওই বাড়ি এবং তার মালিক সম্পর্কে কখনও কোন অভিযোগ ওঠেনি তবে পুলিশের প্রধান কর্তা আর যেটুকু খবর বাড়তি জানেন তা হল এই মানুষটির নাম বঙ্কিমচন্দ্র বরাট। কলকাতায় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা আছে,

অকৃতদার। এখন বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কলকাতা থেকে যখন আসেন তখন যে গাড়ি চালায় সেই রান্না করে দেয় এখানে। মজার কথা সেই ড্রাইভারটাকেও শহরের বাজারে বাজার করতে ছাখেনি কেউ। সম্ভবত ওরা দরকারি জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়েই এখানে আসে।

যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা নাকি ওই জায়গায় বাড়িটা তৈরী করে। ওরকম ছন্নছাড়া জায়গায় কেন তারা বাড়ি করল তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বরাট কোত্থেকে খবর পেয়েই বোধহয় ওই বাড়িটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে কিনে নেন। ঠিক ছ'মাস আগে শহরের পুলিশের কর্তা একটি চিঠি পেয়েছেন। জনৈক অ্যাডভোকেট সুনীল কুমার সামন্ত জানাচ্ছেন যে তাঁর মক্কেল শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র বরাট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে দেহত্যাগ করেছেন। মৃতের উইল অনুযায়ী তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেহেতু তিনি অকৃতদার ছিলেন তাই উইলে উল্লেখিত উত্তরাধিকারীদের সন্ধানে কিছু সময় লাগছে। এই উইল অনুযায়ী ওই শহরে মৃত বঙ্কিমবাবুর যে স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে তা তাঁর ভাগ্নে সুবিমল পাবে। ওই সম্পত্তি সে আজীবন ভোগ করতে পারবে কিন্তু কোন অবস্থায় বিক্রি করার অধিকার থাকবে না। বঙ্কিমবাবু তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি অবশ্য মিশনকে দান করেছেন। খবরটা দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু নিয়ে অবশ্যই কেউ শোকগ্রস্ত হল না কিন্তু উইলের শর্তটি প্রত্যেকের বিস্ময় বাড়ালো। ওই ছন্নছাড়া জায়গায় বাড়িটার প্রতি বঙ্কিমবাবুর এত কী মায়া যে তিনি উইল করে বিক্রি বন্ধ রেখেছেন। তাছাড়া ওরকম জায়গায় বিক্রি করতে চাইলেই বিক্রি হবে এমন ধারণা কেন হল ? কোনও সুস্থ মানুষ ওই জায়গায় বাড়ি পয়সা দিয়ে কিনবে না। তাহলে ? শহরের লোকেরা উইলের এই শর্ত নেহাতই পাগলামো বলে ধরে নিল। সবাই বলতে লাগল ওরকম ঠুঁটো জগন্নাথ হবার জন্যে বঙ্কিমবাবুর সেই ভাগ্নে, যার নাম সুবিমল, সে কখনই ওই

বাড়িতে আসবে না। কিন্তু শহরের লোক ব্যাপারটা ভুল ভাবল।

এই শহরে কোন রেলপথ আসেনি। সুতরাং ওই হাইওয়ে ছাড়া এখানে আসার কোন বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। সেদিন দুপুরে শহরের বাস টার্মিনাসে সদ্য আসা বাস থেকে যেসব যাত্রীরা নামছিল তাদের মধ্যে বছর তেইশের একটি যুবক ছিল। যুবকটি যে নবাগত তা তার চালচলন দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল। যুবকটির পোশাক খুব সাধারণ, গড়ন রোগাটে তবে চোখদুটি খুব উজ্জ্বল। দুহাতে দুটি ঝোলা ছাড়া তার সঙ্গে কিছু নেই। বাস থেকে নেমে সে ইতস্তত তাকাল। তারপর সামনেব পানের দোকানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'থানাটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন ?'

তখন শহরের কেস-না-পাওয়া উকিল বরদাবাবু পাশের দোকানের সামনে ঝোলা নারকেল দড়ির আগুনে বিড়ি ধরাচ্ছিলেন। প্রশ্নটা কানে যেতেই চটপট এগিয়ে এলেন, 'থানা।' 'থানা নিয়ে কি হবে ?'

যুবক বলল, 'থানা নেব না, থানায় যাব।'

বরদাবাবু বললেন, 'বেশ বেশ। তা থানায় কি জন্যে যাওয়া দরকার ? না না, কোন সঙ্কোচ করতে হবে না। উকিল আর ডাক্তারের কাছে কোন কথা গোপন করতে নেই। গোপন করলেই মক্কেলের বিপদ।'

যুবক অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'আপনি বোধহয়—।'

বাধা দিলেন বরদাবাবু, 'ঠিকই, আমি চিনতে পারছি না। মনে হচ্ছে এই শহরে নতুন আসা হয়েছে। আর নতুন না হলে আমাকেও চিনতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবা ?'

'কলকাতা।'

'বাঃ, বাঃ। তা এখনও তো ভাল করে পা দাওনি, এর মধ্যে থানায় যাওয়ার প্রয়োজন কেন হল ? থানা জায়গাটা তো খুব পবিত্র নয়।'

যুবকটি হাসল, 'আমি বাধ্য হয়ে যাচ্ছি। কিভাবে সেখানে যাব তা দয়া করে যদি বলে দেন তাহলে বড় উপকার হয়।'

বরদাবাবু তার আপাদমস্তক দেখলেন, 'তুমি বাদী না প্রতিবাদী?'

'আমি কোনওটাই নই।'

'কিন্তু তোমায় কি কেউ কখনও বলেনি যে, থানায় কখনও একা যেতে নেই। সবসময় সঙ্গে একজন উকিল রাখতে হয়। কি কথা থেকে কি কথা হবে তখন উকিল না থাকলে বাঁচাবে কে। তা কে তোমাকে বাধ্য করল?'

'আমার এক দুঃসম্পর্কের মামা।'

'আচ্ছা? এতবড় ব্যাপার! আমি থাকতে কোন চিন্তা নেই তোমার। ছাখো, এইভাবেই ঈশ্বর যোগাযোগ করিয়ে দেন। তুমি কি কি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ? ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি হরেন উকিলের মত চামার নই। চলো, চলো।'

বরদা উকিল এমন ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগলেন যে যুবকের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হল। হাঁটতে হাঁটতে বরদা উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মামা কি এই শহরে থাকেন?'

'থাকতেন। এখন মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন? মারা গিয়ে তোমাকে থানায় আসতে বাধ্য করেছেন। কি ভয়ঙ্কর লোক? কেউ তো অচেনা নয়, নাম কি তাঁর?'

'বঙ্কিমচন্দ্র বরাট।'

'বরাট। না, এই শহরে ওই নামের কেউ, না আমি তো চিনি না। কি করতেন ভদ্রলোক? তাড়াতাড়ি আলোচনা করে নাও। আমরা থানার কাছে এসে গেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বরাট।' বরদা উকিল নিশ্চিন্তে চিন্তা করতে গিয়ে কপালে ভাঁজ ফেললেন, 'কি বললে? বঙ্কিমচন্দ্র? খুব চেনা চেনা লাগছে। তুমি, তুমি,

সার্কাসের মাঠের ওপারে যে সাহেব বাড়ি তার মালিকের কথা বলছো না তো ?'

যুবক বলল, আমি তো সে সব কিছু জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে বঙ্কিমচন্দ্র বরাটের একটি বাড়ি এই শহরে আছে এবং উইলের নির্দেশ অনুযায়ী আমি সেই বাড়ির মালিক। মামার অ্যাডভোকেট বলেছেন আমি যেন আগে থানায় রিপোর্ট করে তবেই বাড়ির দখল নিই।'

বরদা উকিল পিটপিট করে যুবকের মুখ নিরীক্ষণ করলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের খাঁচা কাঁপিয়ে বের হল, 'তোমার নাম সুবিমল ?'

যুবকটি অত্যন্ত বিস্মিত হল। তার চোখ মুখে সেটা স্পষ্ট। কণ্ঠস্বরেও তা চাপা থাকল না, 'আপনি কি করে জানলেন ?'

'তুমি ছাড়া এই শহরের সবাই জানে। কিন্তু তুমি কেন এসেছ ?'

'বাঃ সম্পত্তির দখল নেব না ? তাছাড়া এখানেই এখন আমি থাকব।'

'মানে ? তুমি জান না কি ভুল করতে যাচ্ছ। ওখানে মানুষ বাস করতে পারে না। চারধারে ধুধু মাঠ, গরম হাওয়া, গাছপালা নেই, পৃথিবীকে গোল দেখায়, ওঃ, কি ভয়ঙ্কর ! বেশিদিন থাকলেই পাগল হতে হবে।' বরদা উকিল শিউরে উঠলেন।

সুবিমল হাসল, আমি খুব গরিব। মা বাবা নেই। চাকরিও পাইনি। একটা নিজের জায়গা যখন পেয়েছি তখন সেটা ছেড়ে দেব কেন ? আচ্ছা, নমস্কার।'

২

দারোগাবাবু বলেছিলেন, "অতদূরে তো হেঁটে যেতে সময় লাগবে তার চেয়ে চারটের বাসটা ধরে কণ্ডাক্টারকে বলবেন, সে বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবে।" সুবিমল মাথা নেড়েছিল। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হল অতক্ষণ অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। এখন সবে তিনটে বাজে। তাছাড়া চাল ডাল এবং কিছু তরকারি কিনে নেওয়া দরকার। দারোগাবাবু বলেছিলেন, "চাকর-বাকর না নিয়ে ওই বাড়িতে থাকা অসম্ভব, খাবেনই বা কি? ত্রিসীমানায় মানুষজনের আনাগোনা নেই।" সুবিমল জবাব দিয়েছিল, "ওসব আমি ভাবি না। দুবেলা দুটো ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে।" দারোগাবাবু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে এই বাড়িটি পেয়ে সুবিমল হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। এর বাড়ি ওর বাড়িতে থেকে ভীষণ ছোট হয়ে যাচ্ছিল সে। অন্যলোকের দয়ায় আর কতদিন থাকা যায়। চাকরির দরখাস্ত করে করে হাল ছেড়ে দেবার মত অবস্থা। টিউশানির টাকায় কোনোমতে চলছিল। তার যে কোনো দুঃসম্পর্কের মামা আছে তাই সে জানতো না। খবরটা যখন পেল তখন মনে হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না। অ্যাডভোকেট যখন শর্তটির কথা উল্লেখ করলেন তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। ভোগ করতে পারবে কিন্তু কখনও বিক্রি করতে পারবে না। এ কীরকম কথা? অ্যাডভোকেট বলেছিলেন, "বঙ্কিকমবাবুর বাড়িটার ওপরে অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল। নইলে উনি ওটা মিশনকেও দিয়ে যেতে পারতেন অন্য পাঁচটা বাড়ির মতো।" শুধু তাই নয়, সুবিমল যদি ওই বাড়িতে নিয়মিত বসবাস করে তাহলে তার খাওয়া পরার জন্যে মাসিক তিনশো টাকার ব্যবস্থা করে গেছেন। তবে সেক্ষেত্রে সে

ততদিনই টাকাটা পাবে যতদিন সে অবিবাহিত থাকবে। অ্যাডভোকেট তাই বলেছিলেন, "এসব দেখে শুনে মনে হচ্ছে বঙ্কিমবাবু চাইতেন ওই বাড়ি দেখাশোনা হোক কিন্তু ওর নির্জনতা যেন দূর না হয়।" সুবিমল এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। তাকে আর অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে না। নিজের বাড়ি আর মাসিক তিনশো টাকায় দিব্যি চলে যাবে তার। তাছাড়া কলকাতা থেকে মাত্র দশ ঘণ্টার রাস্তা, মাসে একদিন চলে এসে সে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যাবে একমাসের মতো। বই পড়ে দিব্যি কাটিয়ে দেবে, দিন।

এসব কথা শুনে দারোগাবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর হেসে বলেছিলেন, "আপনি যেন আবার আপনার মামার মতো করবেন না। তিনি কখন আসতেন কখন যেতেন টের পেতাম না আমরা। তাই সপ্তাহে দিন দুয়েক এদিকে দেখা দিয়ে যাবেন।"

বরদা উকিল যে তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন সেটা আশা করেনি সুবিমল। থানা থেকে বেরিয়ে আসতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন, "কথা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। আপনি হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলেন?"

"মিলিয়ে যাব কি? আমি ভূত-প্রেত না ভগবান? এমন কথা বলা মানে মৃত্যু কামনা করা। যাক, আমি কিছু মনে করলাম না। কেন গেলাম না? যখন দেখলাম তোমার কেসটায় আর্গুমেন্ট করার মতো কিছু নেই তখন চেপে গেলাম। যাক সব ফয়সালা হল? বিড়ি ধরাচ্ছিলেন বরদা উকিল।

"ফয়সালা করার তো কিছু ছিল না। আমি যে এসেছি সেই সংবাদটা জানিয়ে গেলাম। বাজার কোনদিকে বলুন তো?"

"বাজার? বাজারে গিয়ে কী করবে?"

"ওখানে শুনলাম দোকানপাট নেই। খাবার জিনিস নিয়ে যেতে হবে না?" বরদা উকিল যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, "তুমি সত্যি পাকাপাকি থাকবে?"

"হ্যাঁ। তাই তো এলাম।"

"উইলটা তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?"

"দেখেছি। একটা কপি আমার সঙ্গে আছে।"

"আছে ? বাঃ, কই দেখি তো জিনিসটা !" হাত বাড়ালেন বরদা উকিল।

"সেকি ! এই রাস্তার মধ্যেই দেখবেন ?"

"তা অবশ্য।" গুটিয়ে গেলেন বরদা উকিল, "বিক্রি করা চলবে না। খুব অন্যায় কথা। আমি তোমার হয়ে মামলা করব।"

সুবিমল হেসে ফেলল, "মামলা ? কার বিরুদ্ধে ?"

"কেন ? ও, তাও তো বটে। মরা মানুষ আর ভগবানের বিরুদ্ধে কেস হয় না। তা চলো তোমাকে বাজারটা দেখিয়ে দিই।"

বরদা উকিলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সুবিমল জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ব্যাপারটা কী বলুন তো ? আপনিও বলছেন, দারোগাবাবুও বললেন, ওই বাড়িতে থাকা যাবে না। কেন ? ভূতপ্রেত আছে ?"

"ভূত ? না, কখনও শুনিনি সে কথা।"

"তাহলে ?"

"ব্যাপার হল, আমরা কখনই ওই বাড়িতে কাউকে থাকতে দেখিনি পাকাপাকি। তাছাড়া কয়েক মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই এমন জায়গায় একা থাকা যায় ? চাঁদে যদি আমাকে সাতদিন একা থাকতে হয় তাহলে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাব। বলো, ঠিক কিনা ?"

সুবিমল হাসল, "ও এই ব্যাপার। আমার কিন্তু একা থাকতেই ভালো লাগে। আমি বোধহয় আপনার সময় নষ্ট করছি।"

বরদা উকিল মাথা নাড়লেন, "না না, মোটেই না। তাছাড়া আমি যে স্বার্থছাড়া তোমার সঙ্গে কথা বলছি তাই বা ভাবছ কেন ? তোমার যদি কোনো কেস-কাছারির প্রয়োজন হয় তাহলে আশা করব আমার কাছেই প্রথমে আসবে।"

"অবশ্যই। কিন্তু বোধহয় তার প্রয়োজন হবে না।"

দু-তিনদিনের জন্যে জিনিসপত্র কিনতে টিউশনি থেকে জমানো টাকার কিছুটা বেরিয়ে গেল। ব্যাগদুটো বেশ ভারি হয়ে গেছে। বরদা উকিল ওকে চারটের বাস ধরিয়ে দিলেন। সুবিমল তাঁকে অনেকবার অনুরোধ করেছে তার নতুন বাড়িতে একবার ঘুরে যাওয়ার জন্যে। বরদা উকিল হাঁ-না বলেননি।

শহরটা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পেছনে পড়ে রইল। বাসে বেশ ভিড়, বসার জায়গা না পেয়ে সুবিমল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বরদা উকিল কণ্ডাক্টরকে বলে দিয়েছিলেন তাকে কোথায় নামাতে হবে। লোকটা সেটা শোনার পর থেকেই আড়চোখে সুবিমলকে দেখছে।

একটাকা ভাড়া নিয়ে টিকিট দিতে দিতে লোকটা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, "আপনি সাহেব বাড়িতে যাবেন ?"

"হ্যাঁ।" সুবিমল একটু ঝুঁকে জানলা দিয়ে উঁকি মারল বাইরে। ধুধু-মাঠ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ কণ্ডাক্টর একটু জোরে বেল বাজিয়ে চিৎকার করল, "রোককে।"

"এটা স্টপেজ নাকি ?" সামনে থেকে ড্রাইভার খিঁচিয়ে উঠল।

"একজন প্যাসেঞ্জার নামবে সাহেব বাড়িতে।" কণ্ডাক্টরের কথায় ড্রাইভার এত অবাক হল যে তার ব্রেকের জন্যে যাত্রীরা খুব নাড়া খেল। দরজা খুলে নিচে নামার সময় সুবিমল দেখল যাত্রীরা মুখ বার করে তাকে দেখছে। বাস চলে যাওয়া মাত্র সে বাড়িটাকে দেখতে পেল। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা আনন্দ তুবড়ির মত ফুল ছড়াল। এই বাড়ি তার। কাছে কিংবা দূরে যখন অন্য কোনো বাড়ি চোখে পড়ছে না আজ এইটি যে বঙ্কিমচন্দ্র বরাট তাকে দিয়ে গেছেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অদ্ভুত রোমাঞ্চ হচ্ছিল তার।

রাস্তা পার হয়ে সে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ির গেটে তালা ঝুলছে। এই তালার চাবি সে নিয়ে এসেছে। বাস চলে যাওয়ার পর ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোথাও প্রাণের কোনো

চিহ্ন নেই। হঠাৎ একধরনের শূন্যতা অনুভব করে সে নিজেকে শক্ত করল। দূর। বরদা উকিল তো বললেনই কেউ কখনো ভয় পাওয়ার মতো কিছু এদিকে দ্যাখেনি, তাহলে সে ভয় পাবে কেন? তালাটা খুলে গেট সরিয়ে সে ব্যাগদুটো মাটি থেকে তুলে ভেতরে পা বাড়াল। কী আশ্চর্য! লাল ইটের দোতলা বাড়িটা সুন্দর যত্নে রয়েছে যেন। যদিও বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ কিন্তু সুবিমলের মনে হল এই বাড়িতে নিয়মিত মানুষ থাকে। অবশ্য মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগেও বঙ্কিমচন্দ্র বরাট এই বাড়িতে এসেছিলেন। তার মানে লোকটি সত্যি সত্যিই বাড়িটাকে ভালোবাসতেন। সুবিমল দেখল পাঁচিল-এর বাড়ির মধ্যে যে বিরাট জায়গা পড়ে আছে সেখানে এক ফোঁটা ঘাস নেই, গাছ নেই, এমনকি বুনো ঝোপ পর্যন্ত নেই। পুরো চত্বরটাই ন্যাড়া, যেন কেউ উঠোন নিকিয়ে রেখেছে। বাড়ির চারপাশে এরকম জমি অন্তত বিঘে দেড়েক পড়ে আছে। গেটের মুখোমুখি যে ঘর সেটা বোধহয় গ্যারেজ, কারণ গাড়ির চাকা তার সামনে পর্যন্ত গিয়েছে এমন চিহ্ন এখনও রয়েছে। তাছাড়া ঘরটার দরজা নেই। শুধু ছাদ এবং তিনদিকে দেওয়াল। এখানেই গাড়ি রাখতেন বঙ্কিমচন্দ্র।

গেটে আবার ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে ব্যাগদুটো নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল সুবিমল। সদর দরজা বার্মাটিকের ভারি কাঠের। মাঝখানে তালা ঝুলছে। বেশ কসরত করে সেটাকে খুলতে হল। এখনও বাইরে বেশ রোদ। তাই ভেতরেও আলো রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে তৈরি বলে এই বাড়িটার চেহারা আলাদা। এক তলায় গোটা চাকের ঘর। এটা যে ডাইনিং রুম তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ডাইনিং রুমের গায়েই কিচেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিচেনটি বিশাল। এবং তার মধ্যে সুবিমলকে অবাক করে একটি টিউবওয়েল বিদ্যমান। সুবিমল দেখল টিউবওয়েলের সামনেটা ভেজা। হয়তো কিছুক্ষণ আগে এখানে জল পড়েছে। কী করে পড়ল? কোনো মানুষ যদি না থাকে

জল এল কোত্থেকে ? অনেকগুলো সন্দেহ ফণা তুলতেই ও সেগুলোর মাথায় আঘাত করল, টিউবওয়েলের মুখে আটকে থাকা জলও তো গড়িয়ে পড়তে পারে। সে টিউবওয়েলে হাত চালাতেই জল উঠে এল নিচ থেকে। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে সে আর ভাবতে চাইল না তবু মনে মনে খচখচানি থেকেই গেল, তিনমাস ধরে টিউবওয়েলের মুখে আটকে থেকে আজই জলটা বেরিয়ে এল।

ব্যাগদুটো নিয়ে দোতলায় উঠে এল সে। সুন্দর ঝকঝকে সিঁড়ি। একটা কুটো কোথাও পড়ে নেই। দোতলায় বিশাল ঢাকা বারান্দা। বারান্দার গায়ে তিনখানা ঘর। ঘর না বলে টেনিসকোর্ট বলা যায়। মাঝখানের ঘরের টেবিলে ব্যাগ রেখে সে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। ছুড়কো খুলে পাল্লা সরিয়ে দিতেই মনে হল পৃথিবীটা গোল হয়ে নিচে নেমে গেছে। সামনের প্রান্তর থেকে যে বাতাস উঠে আসছে তা ঠিক মানুষের নিশ্বাসের মতো।

৩

সুবিমল ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তার অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল। চোখের সামনে খাঁ খাঁ করছে প্রান্তর। ছোট ছোট বুনো ঝোপ ছাড় একটা গাছও চোখে পড়ছে না। এবং মাটির বুক নিংড়ে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসের মত একটা গরম বাতাস এসে সুবিমলকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কয়েক মাইল-জুড়ে এই পরিত্যক্ত অঞ্চলে কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। রোদ মরেছে কিছুক্ষণ আগে, জ্বাল খেয়ে খেয়ে ছায়ারা এখন এত ঘন যে সন্ধের সর পড়ল বলে। ফলে অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছে এই প্রান্তর। বিকেল পেরিয়ে গেলে ঠাণ্ডা বাতাস বয় পৃথিবীতে, কিন্তু এখানে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জানালায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ সুবিমলের সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। এটাকেই কি ভৌতিক বলে সবাই প্রচার করে? যে অনুভূতির কোন ব্যাখ্যা নেই, এইরকম নির্জনে যে অনুভূতি মানুষকে অসহায় করে তোলে সেই অনুভূতিই কি শেষ পর্যন্ত ভূতের জন্ম দেয়? সুবিমল নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করল। সে এই সাহেব বাড়িতে আসার পর এমন কিছুই চোখে দেখেনি বা কানে শোনেনি যা কোন ভয়ের কারণ হতে পারে।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বরাট যে বিষয়ী ছিলেন এই বাড়ির যে কোন ঘরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায়। জানালা থেকে সরে এসে সুবিমল চারপাশে তাকাল। যে জিনিষটি যেখানে থাকা উচিত সেখানেই রাখা হয়েছে। দেখলে মনে হবে এই বাড়িতে অনন্তকাল মানুষ বাস করছে তাই নিত্য যে জিনিস প্রয়োজন তা হাতের কাছেই মজুদ রাখা আছে। সুবিমল দেখল স্ট্যাণ্ডের ওপর একটা হাউস হ্যারিকেন এবং তারপাশে দেশলাই রাখা আছে। অর্দ্ধেকের

বেশি তেল রয়েছে ওতে। বাতিটাকে জ্বাললো সে। ঘরে যে ভারী কালো ছায়া গুঁড়ি মেরে ঢুকছিল মুহূর্তেই সেটা উধাও হয়ে গেল। এবার দেওয়ালে চোখ পড়ল সুবিমলের। প্রমাণসাইজের একটা ওয়েলপেইন্টিং। নিশ্চয়ই ওটা বঙ্কিমচন্দ্র বরাটের যৌবনের ছবি। লোকটা দেখতে মোটেই ভাল ছিল না যদি এই ছবির চেহারাটা সত্যি হয়। সুবিমল ছবিটার আর একটু কাছে এগিয়ে যাওয়া মাত্র একটা মিষ্টি গন্ধ পেল। মিষ্টি কিন্তু তীব্র। যেন কেউ আতর মেখে এই ঘরে ঢুকেছে। চারপাশে আর একবার দেখে নিল সুবিমল। কেউ নেই, কোন মানুষের সামান্য অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। সুবিমল আর একপা এগিয়ে যেতেই উৎসটা বুঝতে পারল। ছবির গায়ে সে নাক নিয়ে যেতেই মনে হল সমস্ত শরীর ঝিলমিল করছে। বঙ্কিমচন্দ্র বরাটের ছবির গায়ে ওই আতর মাখানো। মানুষের ছবির শরীরে আতরের ব্যবহারের কথা এর আগে কখনও শোনেনি বা পড়েনি সুবিমল। এই মানুষটি শুধু বিষয়ী নন, সৌখিনও ছিলেন। কয়েক পা সরে গিয়ে সুবিমল ছবির মুখের দিকে তাকালো। এই বাড়ি কেন বিক্রি করতে চান না আপনি? কেন এত লোক থাকতে আমাকে খুঁজে বের করে এর দায়িত্ব দিলেন? মনে মনে প্রশ্ন করছিল সে। ছবিতে দাঁড়ানো বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে সুবিমল শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল, ভাগ্যিস আপনি একটু অন্যধরনের মানুষ ছিলেন নইলে আমার ভাগ্যে এরকম বিশাল প্রাসাদের মালিক হওয়া কি সম্ভব হত? নাইবা জীবনে বিক্রি করতে পারলুম, কিন্তু ভোগ করতে তো কোন বাধা নেই।

আজ আর বাড়িটার চেহারা ভাল করে দেখা হল না। সুবিমল ঠিক করল তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে। আজ সারাদিনে প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে। প্রথম দিনে রান্নাবান্নার ঝামেলা করল না সে। বাজার থেকে কেনা কিছু শুকনো খাবার খেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে জানালাটার কাছে ফিরে এল। কেন যে এই

জানলাটা তাকে এত টানছে তা সে জানে না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে আরাম করে বসল। অন্তত পাঁচ ফুট চওড়া জানলা দিয়ে অনেকদূর দেখা যায়। রাত্রের অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর ওপর। প্রান্তরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন। শুধু তারায় ভরা আকাশটা কড়াই এর মত উপুড় হয়ে আছে সামনে। আর যেহেতু মাঠের শেষপ্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে তাই মনে হয় আকাশের তারাগুলো দিগন্তে ফুল হয়ে ফুটেছে। দোতলার জানলা থেকে ওই শূন্য চরাচরকে অস্তিত্বহীন বলে মনে হচ্ছে। চোখের দৃষ্টি স্থির থাকলে কি অন্ধকার তরল হয়ে যায়? নইলে সুবিমল একসময় বুনো ঝোপগুলোকে কি ভাবে দেখতে পেল! একটু একটু করে চোখের সামনে আবছা স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল প্রান্তর। তারপর জলরঙা ছবির মত পড়ে রইল নিচে। কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল সে জানে না, যখন খেয়াল হল তখন বেশ রাত হয়েছে।

৪

এবার ঘুমাতে যাওয়া দরকার। সুবিমল উঠে দাঁড়াল। এবং তখনই মনে হল বাতাস যেন স্বাভাবিক নয়। সে সামনের অন্ধকার বরাবরের দিকে তাকাল। হঠাৎ যেন থম ধরে আছে চারদিক। এবং যেটাকে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল সেই বাতাস ক্রমশ তিরতির করে গরম হতে আরম্ভ করেছে। অবাক সুবিমল আবিষ্কার করল তার পায়ের তলাতেও উত্তাপ। যেন এই বাড়িটাই কোন উনুনের ওপর উঠে বসেছে। আর সেই সময় গন্ধটা তীব্র হল। সুবিমল দ্রুত সরে এল বঙ্কিমচন্দ্রের ছবির সামনে। বঙ্কিমচন্দ্র বরাটের ছবি থেকে গন্ধটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ছে।

এই অবস্থায় কোন মানুষ ঘুমাতে পারেনা। গন্ধের প্রাবল্যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল সুবিমলের। সে গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আবার জানলার সামনে ছুটে গেল। এর মধ্যে বাইরের পৃথিবীতে যেন লাভাস্রোত বইছে। এত উত্তাপ মানুষের পক্ষে সহ্য করা মুস্কিল। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না সুবিমল। এবং তখনই তার নজর গেল আকাশে। একটি অগ্নিবলয় শূন্য থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসছে এদিকে।

বিহ্বল সুবিমল দেখল সেই অগ্নিবলয় পাঁচিলের ওপাশে মরা মাঠে ধীরে ধীরে নেমে স্থির হল। এবং তারপরই আগুন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু একটা একচোখা দৈত্যের মত তার লাল চোখ দপদপ করতে লাগল। প্রচণ্ড সাহস নিয়ে সুবিমল জানলায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা যখন বুঝতে চাইছে ঠিক তখনই নিভে যাওয়া অগ্নিবলয় থেকে আর একটি অগ্নিবলয় আচমকা জন্ম নিল। এবার সেটি এগিয়ে আসতে লাগল এ বাড়ির দিকে।

সুবিমল আর দাঁড়াল না। উত্তপ্ত মেঝেতে টলমলে পা ফেলে সে দৌড়াতে লাগল নিচের দিকে। তার মনে হচ্ছিল সে কোন গরম চড়াইতে দৌড়াচ্ছে। একতলার বারন্দা, দরজা পেরিয়ে সে বাগানে পেঁাছে বসে পড়ল মাটিতে।

আঃ! বাইরের বাতাস কিন্তু টগবগ করে ফুটছে না। উষ্ণতা আছে, কিন্তু সেটা গ্রীষ্মের দুপুরের মতো। মাথার ওপর ঝকঝকে আলপিনের মাথার মতো তারা ছড়ানো। তাদের শরীর থেকে নেমে আসা জ্যোতি অন্ধকারকে খানিকটা তরল করায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিছুদূর। এদিকটায় দাঁড়ালে বাসরাস্তার গেটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আর সব কিছুই আড়ালে। অথচ বাড়ির পেছনে ওই মাঠে যে চোখ জ্বলছিল সেটাকে দেখতে হলে আরও ওপাশে যাওয়া দরকার। সুবিমলের প্রথমে মনে হয়েছিল, ওই বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে এই অনেক ভাগ্য, আবার ওসব কৌতূহলে কাজ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হার মানল। একটু একটু করে তার দেখার আগ্রহ প্রবল হল। ওই ছবি থেকে হাওয়া গন্ধ, শূন্যে ভেসে আসা অগ্নিবলয়, ওইরকম তেতে আগুন হয়ে যাওয়া ঘরের সঙ্গে এই প্রান্তরের নিঃসঙ্গতার নিশ্চয়ই কোনো যোগ রয়েছে যার জন্যে কোনো পাখি এদিকে আসে না, কোনো মানুষ ভুলেও পথ মাড়ায় না। এখানে থাকতে হলে তাকে রহস্যটা জানতেই হবে।

সুবিমল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। বাড়িটার গা ধরে ধরে পেছন দিকের শেষ আড়তটার পাশে দাঁড়িয়ে সে সামনের দিকে তাকাল। না। সামনের মাঠে এমন কিছু নেই যা তার চোখে পড়তে পারে। সেই রক্তচোখের দপদপানিটাকেও খুঁজে পেল না সে। একি আশ্চর্য ব্যাপার! অথচ ওপরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখেছে। কোনভাবেই মনের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। অন্তত পায়ের তলা যে এখনও ছেঁকা লাগলে যেমন লাগে তেমন হয়ে রয়েছে। এটা তো মিথ্যে নয়।

আড়াল ছেড়ে খোলা চত্বরে নেমে এল সুবিমল। কেউ নেই, কোথাও কোনো অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই পাঁচিলটার কাছে পৌঁছে গেল সে। পুরো বাড়িটা কেউ এই পাঁচিল ঘিরে রেখেছে। কিন্তু দোতলার জানলা থেকে সে স্পষ্ট দেখেছে সামনেই সেই বস্তুটা ছিল। অথচ মাঝখানে তো এই পাঁচিল রয়েছে। জানলার দিকে যেটা উড়ে এল সেটা এই পাঁচিলটা টপকে এসেছে। তাহলে বস্তুটি কী? পাঁচিলের ধার ঘেঁষে যেতে যেতে সুবিমল থমকে দাঁড়াল। বেশ খানিকটা জায়গা একদম ফাঁকা। পাঁচিলের এই অংশে কেউ যেন সতর্ক হাতে ইট সরিয়ে নিয়ে গেছে। অথচ নিচে কোনো আবর্জনা পড়ে নেই। সুবিমল সেই ফাঁক গলে বাইরে বেরিয়ে এল। ধু ধু প্রান্তর সামনে পড়ে রয়েছে। কিন্তু বোঝা যায় ধীরে ধীরে সেটা নিচে বেঁকে গেছে। আর তখনই সুবিমল দেখতে পেল ঘোলাটে-শাদা কিছু একটা পড়ে রয়েছে মাঠের মাঝখানে।

জিনিষটা কী দেখবার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছে সুবিমল, কিন্তু সে শক্তিরহিত হয়ে গেল। সেই ঘোলাটে-শাদা জিনিষটা যেন হঠাৎ বেঁচে উঠেছে। তার একটা চোখ দপদপ করতে শুরু করেছে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সুবিমল। আর তখনই পেছনের আকাশে আলো জ্বলে উঠল। বঙ্কিমবাবুর ঘরের জানলা থেকে সেই অগ্নিবলয়টি বেরিয়ে সোজা চলে গেল ওই একচোখো দৈত্যের শরীরে। চারপাশের উত্তাপ এত বেড়ে গেল যে সুবিমলের মনে হল তার শরীরের সব মাংস গলে পড়ল বুঝি। আলোটা মাথার ওপরে আসতেই মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল সুবিমল। আর তারপরেই সেই শাদা-ঘোলাটে চ্যাপ্টা বস্তুটি নিঃশব্দে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে গেল। ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল সেটা। সেই এক চোখো আলো মিশে গেল হাজারটা তারার মধ্যে। এবং কী আশ্চর্য, দ্রুত পৃথিবীর উত্তাপ কমে যেতে লাগল। চারধার যেরকম গরম হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে তা বেশ সহনীয় হয়ে এল। উঠে দাঁড়াল সুবিমল।

না, এটা কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়। চোখের সামনে যে ঘটনাটা ঘটল তাকে অলৌকিক বলে উড়িয়ে দেওয়া বোকামি। কিন্তু সুবিমল এসবের কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। চ্যাপ্টা জিনিসটা কী? অগ্নিবলয় বলে যেটাকে মনে হচ্ছিল সেটা কি সত্যিকারের আগুনের বালা না চোখের ভুল? সত্যিকারের আগুন হবে না নিশ্চয়ই, কারণ প্রথম যখন ওটাকে দেখেছিল তখন একটা মানুষের আকৃতি ভেসে উঠেছিল। আগুন যদি হয় তাহলে তার মধ্যে···। হঠাৎ রোমাঞ্চিত হল সুবিমল। এই যে শাদা ঘোলাটে চ্যাপ্টা বস্তুটি ওখানে পড়েছিল সেটা স্পেসক্রাফট নয় তো। কোনো গ্রহ থেকে কেউ এখানে ওটায় চেপে বেড়াতে এসেছিল। এসে ওখানে ভেলাটাকে পার্ক করে ওই বাড়িতে বেরিয়ে গেল। শিহরিত হচ্ছিল সুবিমল। পত্র-পত্রিকায় এই ধরনের খবর পড়েছে সে। কিন্তু চোখের ওপর ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? যত ভাবছিল তত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল সুবিমল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, যখন রাত আরও গভীর, তখন সুবিমল ভেবে-চিন্তে ঠিক করল, এই ঘটনার কথা আর কাউকে বলা যাবে না। যতক্ষণ ব্যাপারটা সম্পর্কে সে নিজে নিশ্চিন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ শহরে গিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে কতগুলো প্রশ্ন এল। এক, এটি কি? যদি অন্য গ্রহের ভেলা হয় তাহলে এখানে নিয়মিত আসে কিনা! দুই, ওই বস্তুটি উপস্থিত হবার আগে বঙ্কিমবাবুর ঘরের ছবি থেকে গন্ধটি বের হয়ে তীব্রতর হচ্ছিল। এই দুটোর মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে কিনা? না থাকলে সোজা ওই অগ্নিবলয় মাঠ থেকে উঠে জানালায় আসবে কেন? তিন, গন্ধের উৎস কোথায়? কেন গন্ধটি ওইসময় বেড়ে ওঠে? চার, অগ্নিবলয় বলে যেটাকে মনে হয়েছে সেটা আসলে কী? পাঁচ, ওই বস্তুটি মাঠে নামার পর থেকেই এখানকার আবহাওয়া হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে যায় কেন? বাড়িটার মেঝেতে

পর্যন্ত পা রাখা যায় না কেন? ছয়, ভিন্ন গ্রহের জীব যদি হয় তাহলে কাছের শহরের কেউ এর অস্তিত্ব জানল না কেন? এই যে ধুধু প্রান্তর বৃক্ষহীন হয়ে পড়ে আছে তা কি ওই ভেলার কারণে? আর সাত নম্বর প্রশ্ন হল, কেন এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছে ওই যন্ত্র কিংবা ভিন্নগ্রহের মানুষ? এবং মৃত বঙ্কিমবাবু কি ওদের কথা জানতেন? না জানলে বাড়ির দলিলে তিনি বিক্রি করার অধিকার দেননি কেন?

সেই বিস্তীর্ণ চরাচরে ক্রমশ শীতল বাতাস ভেসে এল। ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে অন্যমনস্ক সুবিমল ফিরে এল বাড়িতে। না। এখন আর বাড়িটা তেতে নেই। সদর দরজা বন্ধ করে সে দোতলায় উঠে দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকতে যেতেই মনে হল ছবির ঘরটাকে একবার দেখা যাক। এই সমস্ত রহস্যের কোনো গূঢ় কারণ ওই ঘরে লুকোনো আছে বলে তার মনে হচ্ছিল। দরজাটা বন্ধ। সুবিমল নিঃশব্দে সেই দরজায় কান পাতল। কোনো শব্দ নেই। কিন্তু এখনও সেই গন্ধটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে বাইরে আসছে। যদিও তার এখন অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে তবু সুবিমলের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

দ্বিতীয় ঘরে ফিরে এল সুবিমল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। এখন আকাশের চেহারা অত্যন্ত নিরীহ। নীল বেনারসি শাড়ির গায়ে অজস্র চুমকি বসানো কিংবা ভরা পিন-কুশনের মতো। কিন্তু এই জানলা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীটা গোল। কারণ সামনের ওই মাঠ ঢালু হয়ে ক্রমশ নিচে নেমে গেছে না কিনা তারার আলোতেও স্পষ্ট।

খাটে ফিলে এল সে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না আজ। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আশা ছেড়ে দিল সুবিমল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জানলার পাশে গিয়ে বসল সে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আকাশের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল সে যেন ওই তারাদের রাজ্যে চলে গিয়েছে।

এবং তখনই একটা নাম না জানা তারা খসে পড়তেই সে চেতনা ফিরে পেল। পাশের ঘরটা আবার তাকে টানছে। এবার আর উপেক্ষা করতে পারল না সুবিমল।

দরজা খুলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। গন্ধটা এখনও পাক খাচ্ছে কিন্তু তীব্রতা নেই। হু হু করে খানিকটা গন্ধ খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে সে ঘরে পা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে পড়ে থাকা কোনো কিছুতে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল সুবিমল। পড়ার সময় দুহাতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে করতে সে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর আতঙ্কটা ধীরে ধীরে কমে গেলে সে উঠে বসল। সুবিমলের সমস্ত শরীর আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই ঘরের মেঝেতে তো খানিক আগে এমন কিছু পড়ে ছিল না যাতে হোঁচট খেতে হয়! একটা অজানা আতঙ্কে সে ছিটকে এল বাইরে।

৫

পরদিন সুবিমলের যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদের তেজ বেড়েছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে চারদিক তাকাল। ছিমছাম রোদ্দুরে সমস্ত পৃথিবী ভাসছে। এই ঘরটা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। এমনকি যে তক্তাপোষে সে শুয়ে আছে সেটাও ধুলো মাখা। ঘুম ভাঙা মাত্র গতরাতের ঘটনাগুলো ওর মনে পড়ল। ওঘর থেকে বেরিয়ে এইঘরে এসে অনেকক্ষণ বুকের ধড়ফড়ানি কমেনি। কী ছিল পাশের ঘরে মেঝেয় পড়ে? সেট কি নড়ছিল? চুপচাপ তক্তাপোষে শুয়ে সে আকাশ দেখে গেছে। তারপর ভোরের দিকে কখন ঘুম এসেছে সে জানে না।

এখন এই সকালে উঠে তার দুটো ইচ্ছে তীব্র হল। এক, পাশের ঘরের মেঝেতে কী পড়ে আছে দেখতে হবে। দুই' প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, খেতে হবে। সুবিমল সর্তক পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজাটা আধ-ভেজানো। কাল দৌড়ে বের হবার সময় পাল্লাদুটোয় ধাক্কা লেগেছিল। তার ফলেই ওরকম আধ-ভেজানো হয়ে যেতে পারে। সে সন্তর্পণে দরজাটা হাট করে খুলতেই হেসে ফেলল। একটা টেবিল কাত হয়ে পড়ে আছে। এটাতেই হোঁচট খেয়েছিল সে। এবার নিজেকে খুব বোকা মনে হচ্ছিল সুবিমলের। উফ্! মানুষ ভয় পেলে কীরকম অন্ধ হয়ে যায়। তার পরেই সে সজাগ চোখে ছবিটাকে দেখল। কালকের মতনই নিরীহ চেহারার কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কোনো গন্ধ নেই। ঘরের সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল সুবিমল। না, কোনো গন্ধের অস্তিত্ব কিংবা উৎস খুঁজে পেল না সে। অথচ গতরাত্রে সেই তীব্র নেশার মতো গন্ধটা এই ঘর থেকেই বের হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল সুবিমল। ওই মাঠ থেকে উঠে আসা

জিনিসটা যদি জানলা দিয়ে এই ঘরে ঢুকে থাকে তাহলে তারও কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুবিমলের মাথার মধ্যে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সে এগিয়ে গিয়ে খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিল।

নিচে গিয়ে ভাল করে স্নান সেরে পেট ভবে খেয়ে নিল সুবিমল। তারপরই ওর ঘুম পেয়ে গেল। সারারাত জেগে ভোরে ঘুমিয়েও শরীরটা টিমটিম করছিল। ঘুম ভাঙল যখন, তখন ভর দুপুর। এবার সমস্ত বাড়িটাকে ঘুরে ঘুরে দেখল সে। চারধার এত শান্ত যে অস্বস্তি হয়। একটা পিন পড়ে গেলে যেন তার আওয়াজ শোনা যাবে। শুধু ওপাশের বড় রাস্তা দিয়ে যখন কোন গাড়ি ছুটে যায় তখন তার আওয়াজটা এই নৈঃশব্দকে নষ্ট করে। অনেকগুলো ঘর এই বাড়িতে। বঙ্কিমবাবু মানুষ হিসেবে শৌখিন ছিলেন বোঝা যাচ্ছে। সুবিমল লক্ষ্য করল সব ঘরেই অনেকদিনের অব্যবহারে ধুলো জমেছে। মানুষজনের পা পড়েনি বোঝা যায়। কিন্তু ওপরের ছবির ঘরটি ব্যতিক্রম। সেটাকে যেন রোজ ঝাড়পোঁছ করা হয়।

দুপুরে দুটো ভাত ফুটিয়ে খাওয়া সারতেই রোদের তেজ কমে এল। এখন শরীর বেশ চাঙ্গা লাগছে। সুবিমল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। চারপাশে ঘুরে ঘুরে সে বাড়িটাকে দেখছিল। না, কোনো অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। খোলা জমির দিকে তাকাল সে। ন্যাড়া মাটি, কোনো গাছ-গাছালি নেই। এমনকি পাঁচিলটা পর্যন্ত পরিষ্কার। শুধু যে অংশ ভেঙে গিয়েছে সেখান দিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর চোখে পড়ছে। পায়ে পায়ে সেটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সুবিমল। বেশ মিষ্টি বাতাস বইছে। এখানে দাঁড়ালে বোঝা যায় পৃথিবীটা গোল। বিশাল শুকনো মাঠটা ক্রমশ বেঁকে গিয়েছে ওপাশে। এতবড় মাঠে কোনো বড় গাছ নেই। ঝোপের মতো যেগুলো মাঝে মাঝে ছড়িয়ে সেগুলোয় শুধুই কাঁটা। সুবিমল পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। যে জায়গায় গতরাত্রে সেই চ্যাপ্টা

জিনিসটাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল সেখানে পৌঁছতেই ওর বুক ধড়াস করে উঠল। প্রায় চল্লিশ ফুট জায়গা কালচে হয়ে গেছে। স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে এমন কিছু ছিল যার চাপ বা তাপ এই মাটির চেহারা পাল্টে দিয়েছে। স্তম্ভিতের মতো সে কিছুক্ষণ ওই দিকে তাকিয়ে থাকল। গতকাল সে যা দেখেছে তাহলে তার একটাও স্বপ্ন নয়। এখানে কেউ এসেছিল ওই যন্ত্রে চড়ে। যন্ত্রটাকে এই মাটিতে রেখে সে বেরিয়ে গিয়েছিল ওই জানলা লক্ষ্য করে। কে সে? হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল সুবিমলের। প্রায় দৌড়ে সে ফিরে এল বাড়ির সামনে। কী করবে এখন? এই ভয়ঙ্কর বাড়িতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। বঙ্কিমবাবু কি এসব রহস্য জানতেন? জেনেই কি তিনি ওইরকম একটা উদ্ভট উইল করে গেছেন? এখানে সে একা থাকবে কী করে? একা শান্তিতে থাকবে বলে যে ইচ্ছেটা তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সেটা নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছিল।

এইসময় গাড়ির হর্ন শুনতে পেল সুবিমল। বড় রাস্তার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ হর্ন বাজাচ্ছে। কৌতূহল হল তার। এখানে কেউ আসবে এমন কথা ছিল না। মানুষের অস্তিত্ব তাকে প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে এল গেটের কাছে। জিপের সিটে বসে ওসি হাসলেন, "যাক, আপনি বেঁচে আছেন! এদিক দিয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে যাই।"

সুবিমল হাসবার চেষ্টা করল, "অনেক ধন্যবাদ। ভেতরে আসুন।"

ওসি বললেন "না, না। ভেতরে যাব না। তা আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?" সুবিমল একবার ভাবল কাল রাত্রের সব ঘটনা খুলে বলে। কিন্তু লোকটার ঠোঁটে কেমন সন্দেহের হাসি যেটা ওর মনটাকে বিগড়ে দিচ্ছিল। সে মাথা নাড়ল, "না, অসুবিধে কিসের। শুধু একা একা থাকতে হয় এই যা। কোনো মানুষ তো চোখে পড়ে না।"

ওসি মিটিমিটি চোখে সুবিমলকে দেখলেন, "কাল রাত্রে ভয় পাওয়ার মত কিছু ঘটেনি তো?"

"একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? সেরকম কিছু ঘটে নাকি?"

"লোকমুখে শুনেছি, নিজের চোখে দেখিনি। মাঝরাত্তিরে যারা এ পথে গাড়ি নিয়ে যায় তারা বলে এই জায়গাটায় এলেই হাওয়া খুব গরম হয়ে যায়। একবার, তখন এখানে বঙ্কিমবাবু বেঁচে ছিলেন, শহরের লোক দেখেছিল এখানে উল্কাপাত হতে। পরদিন খোঁজ নিয়ে কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। এমনকি বঙ্কিমবাবু পর্যন্ত বলেছিলেন সেরকম কিছুই নাকি হয়নি। আমি বেশিদিন এই থানায় আসিনি। কিন্তু এই জায়গায় অস্বাভাবিক কিছু হয় এব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। আপনি গতরাত্রে এখানে যখন কিছু বুঝতে পারেননি, ওসি হাসলেন, "ঠিক আছে চলি। ও হ্যাঁ, উকিলবাবু আজ সকালে আসতে চেয়েছিলেন আপনার কাছে। কিন্তু ওঁর বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আসতে পারেননি।"

মাথা নেড়ে ওসি জিপের স্টিয়ারিং ঘোরাতে যাচ্ছিলেন, সুবিমল ওঁকে থামাল। বলল, "দারোগাবাবু, একমিনিট। আপনি কালকে কি এ রাস্তায় আসবেন?"

"কেন বলুন তো?"

"যদি আসেন তাহলে দয়া করে একবার দুবার হর্ন বাজাবেন।"

"কেন?"

"এখন বলতে পারব না। হয়তো আপনার সাহায্য খুব দরকার হবে।"

"কী ব্যাপার বলুন তো, কোনো সন্দেহজনক মানুষকে কাল রাত্রে এদিকে দেখেছেন নাকি?"

"না, সেরকম কিছু নয়।"

ওসি যে কথাটা বিশ্বাস করলেন না তা চলে যাওয়ার আগে ওঁর চাহনিতেই বোঝা গেল।

বিকেলটা আচমকা ফুরিয়ে গেল। ছায়াতে ছায়ার মিশেল যত ঘন হচ্ছিল তত চারপাশের শূন্য চরাচর মলিন হয়ে আসছিল। সমস্ত বিকেল সুবিমল সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে ভেবেছে। দারোগাবাবুকে আজ সে ইচ্ছে করেই কালকের ঘটনাটা বলেনি। সে নিজে আরো বিশদ না জেনে কাউকে বলবে না। সুবিমলের মনে এক-ধরনের জেদ জন্ম নিচ্ছিল।

সন্ধের আগেভাগে সে রাত্রের খাওয়া সেরে নিল। আজ রাত্রে সে ওই বাড়িতে থাকবে না। কারণ ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে গরমে কষ্ট পেলে কিছুই দেখা যাবে না। সুবিমল মনে মনে কী করবে তার ছক এঁকে নিল।

সন্ধের অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে এলে সুবিমল বাড়ির পেছনের জমি পেরিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক গলে বিশাল মাঠে চলে এল। এখন শীতল বাতাস বইছে। মাথার ওপর যেন গিজগিজ করছে তারারা। আকাশটা যেখানে মাঠের প্রান্তে বেঁকে গিয়েছে সেখানে চোখ রাখলে মনে হয় মাঠের গায়ে তারার ফুল ফুটে আছে। সেই পোড়া জায়গাটা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এসে সুবিমল চারপাশে তাকাল। তারপর খুঁজে খুঁজে একটা গর্ত বের করল সে। কাঁটাঝোপের আড়ালে ফুট চারেক গভীর গর্তটায় কয়েকটা পাথর পড়ে রয়েছে। কাছে যেতেই একটা শব্দ হল। তারপর দুটো ছোট জন্তু তীরের মতো বেরিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। ও যে শেয়াল তাতে নিঃসন্দেহ হল সুবিমল। যাক, শেয়ালের মতো প্রাণীও এখানে থাকে দিনের বেলায়।

যতটা সম্ভব আরাম করে বসল সুবিমল। ক্রমশ অন্ধকারে তার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে পাঁচিলের ওপাশের বাড়িটাকে দেখল। কেমন ভৌতিক দেখাচ্ছে এখান থেকে। হঠাৎ হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। সুবিমলের শরীর ছমছম করে উঠল আচমকা। সে ত্রস্তে চারপাশে তাকাল। না, সন্দেহজনক কিছুই তো চোখে পড়ছে না। মাথার ওপরে তাকাল সে। মনে হল,

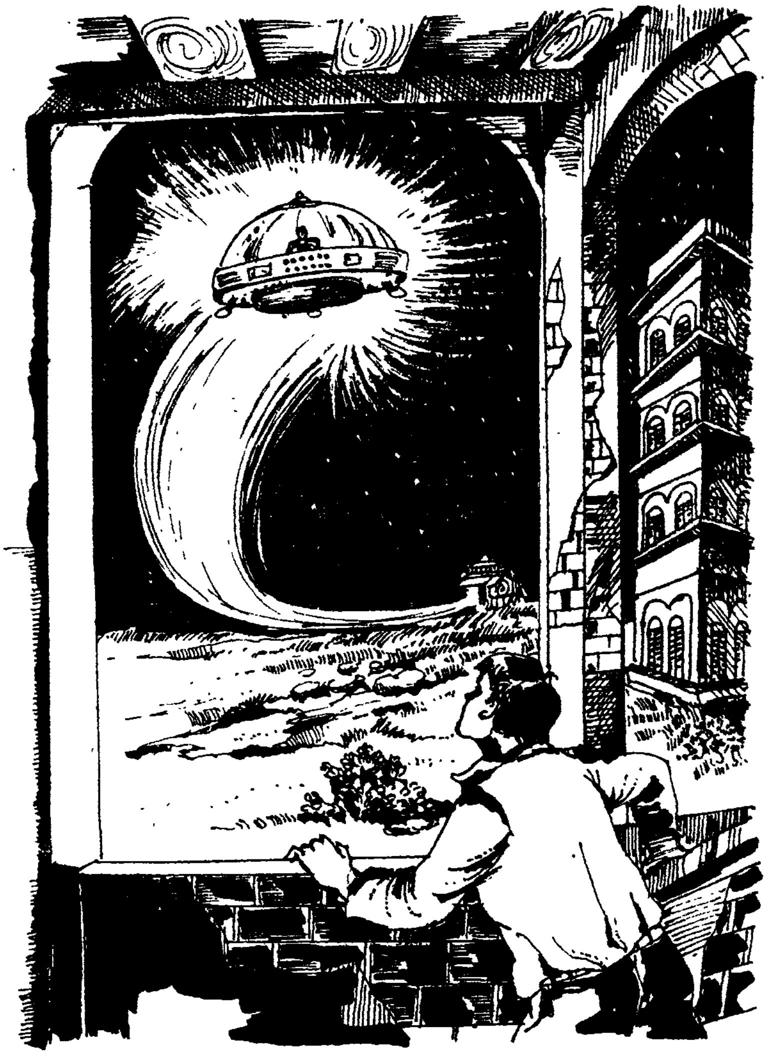

লক্ষ লক্ষ একচোখো দৈত্য তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সে নিজেই যেন অন্ধ হয়ে যাবে। হঠাৎ মনে হল একটা একচোখো দৈত্য যেন আকাশের সঙ্গীদের ছেড়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। এবং নামতেনামতে সে তার চোখটাকে বন্ধ করে ফেলল। সুবিমল গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল, কারণ হঠাৎ বাতাসের তাপ বাড়তে আরম্ভ করেছে।

৬

জ্বলন্ত চোখটা ক্রমশ নিচে নেমে আসতে লাগল। সুবিমল হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। ওটা কিছুতেই সেই রূপকথার দৈত্য হতে পারে না। কারণ দৈত্যদের আসার সময় চারধারের আবহাওয়া এরকম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে আজ অবধি কোনো বইতে সে পড়েনি। তাছাড়া এইযুগে দৈত্য! লোকে শুনলেই পাগল বলবে। কিন্তু যেভাবে ওটা নেমে আসছিল তাতে দৈত্য ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না।

গর্তের মধ্যে যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে ফেলল সুবিমল। দৈত্যটা আসছে অত্যন্ত নিঃশব্দে। আলোটা বোধহয় নিভিয়ে দিয়েছে কারণ রাতের আলো ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ছে না। হঠাৎ সুবিমলের মনে হল ওর শরীর জ্বলছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরুলিয়া আসানসোলের দুপুর রোদে খালি মাথায় হাঁটলেও এত জ্বলুনি হয় না। মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরে এবার ফোস্‌কা পড়বে। দুহাতে মুখ ঢেকে গর্তের মধ্যে পড়ে রইল সে। মাটি পর্যন্ত এত তেতে উঠেছে যে এভাবে পড়ে থাকা কতক্ষণ সম্ভব হবে কে জানে।

মিনিট দশেক পরে সুবিমল বেপরোয়া হল। এইভাবে মুখ গুঁজে সেঁকে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। সে ধীরে ধীরে মুখ তুলতেই চমকে উঠল। আজ সকালে সে জাগাটায় একটা পোড়া দাগ দেখতে পেয়েছিল ঠিক সেখানেই রুপোলি কাছিমের মতো কিছু দাঁড়িয়ে আছে। কাছিমটার কোনো মুখ নেই এবং শরীরের তলায় তিন চার ফুট চ্যাপ্টা পা রয়েছে। ওটা যে ইস্পাত কিংবা ওই জাতীয় কিছুতে তৈরি তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। সামান্য মাথা বের করে সুবিমল বিস্মিত হয়ে বস্তুটাকে দেখছিল। এই যে এত গরম লাগছে তা ওই কাছিমের আসার জন্যেই এবং সেই কারণেই

এতবড় প্রান্তর ফাঁকা পড়ে থাকে দিনরাত। দু একটা জন্তু জানোয়ার যারা মরিয়া হয়ে পড়ে থাকে এখানে তারা কাছিম আসার আগেই নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যায়। এই উত্তাপই কি এখানে বড় গাছপালা জন্মাতে দেয় না। সুবিমল যতটা সম্ভব আড়ালে থেকে কাছিমটাকে লক্ষ্য করছিল। চেহারাটা চকচকে কিন্তু নিরীহ। কোথাও সামান্য আলোর চিহ্ন নেই। অথচ ওরই একটা চোখ জ্বলছিল। চোখটা এখন নজরে পড়ছে না। আকাশ থেকে উড়ে এসেছে যখন তখন ওটা কোনো এক ধরনের বিমান অথবা মহাকাশযান? সুবিমল এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। এটা যদি আমাদের মহাকাশযান নামার গোপন জায়গা হয় তাহলে চারধার এত খোলামেলা পড়ে থাকত না। এই সময় কাছিমটার শরীরের একটা অংশ নড়তে লাগল।

দুটি চোখ গর্ত থেকে বের করে সুবিমল লক্ষ্য রাখছিল। সামনেই একটা ছোট ঝোপ থাকায় তাকে সরাসরি কেউ দেখতে পারবে না। কাছিমের যে অংশটা কাঁপছিল সেটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। কয়েকমুহূর্ত একটা নীল আলো ছাড়া কিছুই নজরে এল না। তারপর ধীরে ধীরে একটা গাড়ির চাকার মতো জিনিস বেরিয়ে এল ওর পেটের ভেতর থেকে। চাকাটা যেন কাঁচে মোড়া। আর তার মধ্যে কেউ একজন বসে রয়েছে। বেরিয়ে আসামাত্র চাকার ভেতর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল। হাউই-এর মত চাকাটা ছুটে গেল আকাশে। তারপর ধীর গতিতে এগিয়ে গেল বাড়িটার জানলা লক্ষ্য করে। এইবার গতরাতের রহস্যটা স্পষ্ট হল সুবিমলের কাছে। এই কাছিমের পেট থেকে বেরিয়ে চাকায় চেপে কেউ রোজ রাত্রে ওই ঘরে যায় এবং তার ফলেই বাড়িটা এত গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু গন্ধটা এত তীব্র হয়ে ওঠে কেন? যে যায় সে কি ওই গন্ধের টানে ছুটে যায়? সুবিমল আবার কাছিমটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। ফাঁকা মুখটায় কী একটা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। খুব রোগা রোগা তার হাত পা

শরীর একটা মোটা নলের মতো গোল, মাথার ওপর যেন একটা গোল হেলমেট চাপানো, ফলে মুখ দেখা যাচ্ছে না। কাছিমের মুখে এসে সে এপাশ ওপাশে তাকাল। তারপর ছোট্ট একটা সিঁড়ি নামিয়ে দিল নিচে। ঠিক মানুষের মতই ওটা নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে নিচে। তারপর মুখ তুলে আকাশের দিকে একবার তাকাল। সুবিমলের মনে হচ্ছিল একটা ছোট্ট শিশু যেন মাথায় ওইরকম একটা টুপি পরে এই মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে যদিও তার শরীরটা মানুষের মতো নয়। হঠাৎ সুবিমলের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হল। এরা অন্যগ্রহের মানুষ নয়তো! এতকাল যাদের কথা সেই বইপত্রে পড়ে এসেছে তাদের একজনকে কি সে সামনে দেখছে? বিদঘুটে চেহারাটা এখন মাঠের মধ্যে পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝে বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে।

এতক্ষণে সুবিমলের ভয় ভাবনা কমে এসেছে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল ওই বেমানুষটির সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে। কিন্তু ঠিক সাহস হচ্ছিল না ওর। বেমানুষটা এখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বাড়ির পাঁচিলের ভাঙা অংশটার কাছে দাঁড়িয়ে বোধ-হয় উঁকি মারছে ভেতরে। সুবিমল কাছিমটার দিকে তাকাল। ওতে কি আরও বেমানুষ বসে আছে? যদি না থাকে তাহলে কাছিমের ভেতরটা দেখার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। দ্বিধা কাটিয়ে উঠল সুবিমল, তারপর এক দৌড়ে সিঁড়িটার গায়ে গিয়ে পৌঁছালো। সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল বেমানুষটার মুখ এখনও বাড়ির দিকে। চটপট কাছিমের ভেতরে ঢুকে পড়ল সুবিমল। ঢুকেই ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অনেকগুলো ছোট ছোট আলো দপদপ করে জ্বলছে আর নিভছে। ভেতরটায় প্রচণ্ড গরম। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হল না সুবিমলের পক্ষে। সে দ্রুত বাইরের দিকে পা বাড়াবার সময় দেখল ডানদিকে একটা র‍্যাকমতন জায়গায় গোল টায়ার রাখা আছে। অবিকল সে বস্তুটি চেপে প্রথম বেমানুষটি বাড়িটার দিকে উড়ে গিয়েছিল ঠিক সেই জিনিস।

লোভ সামলাতে পারল না সুবিমল। হাত বাড়িয়ে টায়ারটা ধরতে গিয়ে বুঝল ওটা ঠিক রবার নয়। কিন্তু খুব হালকা এমন একটা মেটাল যা ও কখনো চোখে দ্যাখেনি। দুই হাতে সেটাকে ধরতে বুঝল এটা দশকেজির বেশি ওজন নয়। এক হাতে চাকাটাকে ঝুলিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে। দ্বিতীয় বেমানুষটি তখনও এদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। পড়ি কি মরি করে সুবিমল সেই গর্তে ফিরে এসে কুঁজো হয়ে বসল। আর তখনই দ্বিতীয় বেমানুষটি ফিরে আসছিল গুট গুট করে।

ফিরে আসার কারণটাও ধরতে পারল সুবিমল। মাথায় ওপরে তখন সেই আলোটা জ্বলছে, ফিরে এসেছে বাড়ি থেকে প্রথম বেমানুষ। ধীরে ধীরে দুজনেই কাছিমটার পেটে ঢুকে যেতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সুবিমলের আর উত্তাপ সহ্য হচ্ছিল না। ওর চেতনা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। অসাড় চোখে সে দেখল কাছিমটা নিঃশব্দে উঠে গেল আকাশে। মুখ তুলে সেটাকে দেখার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না সুবিমলের।

প্রায় আধঘণ্টাটাক বাদে সুবিমলের চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে এল। এতক্ষণে নিজেকে সুস্থ মনে হচ্ছে খানিকটা। যদিও হাত পা মুখ ঝলসে গিয়েছে বেশ সে এবার চাকাটাকে দেখল। গোল জিনিসটার ভেতরে কিছু যন্ত্রপাতি আছে। কাঁচের মতো কিছু ঢেকে রেখেছে জিনিসটাকে। একজন লোক স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে ভেতরে। সুবিমল মুখ তুলে দেখল। কাছিমটার কোনো হদিশ নেই চারপাশে। আর আশ্চর্য, উত্তাপটা এখন বেশ কমে এসেছে। সে গর্ত থেকে বেরিয়ে যেখানটায় কাছিম নেমেছিল সেখানটায় গিয়ে দাঁড়াল। মাটি ওখানে আগুনের মতো তেতে রয়েছে। সুবিমল আকাশের দিকে তাকাল। কাছিমটার কোনো চিহ্ন নেই। ওরা নিশ্চয়ই চাকাটাকে খুঁজে না পেয়ে অবাক হবে। সুবিমলের মনে হল এখনই তার এখান থেকে পালানো উচিত। সে দৌড়ে চাকাটার কাছে ফিরে গেল। তারপর ওটাকে তুলতে

গিয়ে নজরে পড়ল একপাশে ছোট্ট সুইচ রয়েছে। সেটা নিয়ে টানাটানি করতেই কাঁচের ঢাকনাটা খুলে গেল। সুবিমল দেখল ভেতরের বসার জায়গাটা চমৎকার। সে আর দ্বিধা না করে ভেতরে বসে সুইচটা টিপতেই আবার কাঁচ বন্ধ হয়ে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে ওব মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে। সুইচটাকে সামান্য চাপ দিতে কাঁচেব ঢাকনা আবাব খুলে গেল। কযেকবাব চেষ্টাব পর সে ঢাকনার মুখটাকে সামান্য খুলে রাখতে সক্ষম হল। এখন স্বচ্ছন্দে বাতাস ঢুকবে ওই ফাঁকটুকু দিয়ে।

এবার সুবিমল মন দিল যন্ত্রপাতিব দিকে। একটা বোডের ওপর কিছু হিজিবিজি অক্ষরে যা লেখা তাছে তা বোঝা অসম্ভব। আর একটা কাণ্ড হয়েছে এব মধ্যে, সে সিটে বসাব পব থেকেই ভেতরে একটা আলো জ্বলতে শুরু কবেছে আপনাআপনি। সে বোর্ডেব ওপর সাজানো নবগুলো ঘোবাতে লাগল। হঠাৎ মনে হল চাকাটা দুলছে। তারপর সোঁসোঁ কবে তাকে নিয়ে সোজা ওপরে উঠে যেতে লাগল। সুবিমল এতখানি ঘাবড়ে গিযেছিল যে সে কী করবে বুঝতে পারছিল না। বাড়িটাব ছাদ এখন পাযেব তলায়। এবার সে মবিয়া হযে অন্য নবগুলো ঘোবাতে লাগল। এভাবে উঠলে তাকে এটা চাঁদের গাযে নিয়ে ফেলবে, কোনোদিন বেঁচে ফিরে আসতে হবে না। তাব ওপর অদ্ভুত আলো বিচ্ছুবিত হচ্ছে সামনে থেকে।

৭

হঠাৎ ঝাঁকুনি লাগল চাকাটায়, তারপর চরকির মত ঘুরতে লাগল একই জায়গায়। সুবিমলের শরীর বারবার আছাড় খাচ্ছিল ওই ছোট্ট পরিসরে। কিছুক্ষণের জন্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল সে। তারপর হাত বাড়িয়ে বাকি নবগুলো টিপতে টিপতেই আচমকা ঘোরা থেমে গেল। সুন্দর ভেলার মত শান্ত জলে ভাসছে এমন ভাবে রইল চাকাটা। কপালের ঘাম মুছল সুবিমল তারপরে আবার নবগুলো দেখতে লাগল। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করল কায়দাটা। তারপর কিছুক্ষণ এদিক ওদিকে ভেসে বেড়িয়ে সে বাড়িটার দিকে তাকাল। চাকাটাকে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে জানলাটার কাছে নিয়ে এল। এর যা আয়তন স্বচ্ছন্দে ভেতরে চলে যাওয়া যায়। চট করে ঢুকে গেল সুবিমল ঘরের মধ্যে, তারপর চাকাটাকে মেঝেয় নামাতেই গন্ধটা টের পেল। এখন গন্ধ তীব্র নয় তবু ঘরে বেশ ম-ম করছে। সুইচ টিপে ঢাকনা খুলে সে বেরিয়ে এল বাইরে। অন্ধকার এখন চাকার আলোয় ঘরছাড়া। সুবিমল ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল। এবার গন্ধ তীব্রতর হচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মনসংযোগ করার পর একটা অংশ ধরতে পারল গন্ধের উৎস হিসেবে। তারপরে ফিরে এল চাকাটার কাছে। এসে আশ্চর্য হল। চাকার ভেতরে একটা ছোট আলো জ্বলছে আর নিভছে। চট করে উবু হয়ে বসে সে প্রধান নবটিকে ঘোরাতেই আলোটা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর চাকাটি সক্রিয় নয়। যাদের জিনিস তারা কি এর খোঁজ করছে? এই আলো কি তারাই জ্বালিয়ে সঠিক স্থান নির্ণয় করে নিল? সুবিমলের মনে হল যেমন করেই হোক এটাকে লুকোতে হবে। চাকাটাকে তুলে অন্ধকার ভেতরের বারান্দা দিয়ে

সে ছুটে এল নিচে। তারপর একটা পরিত্যক্ত কাঠের বাক্সের মধ্যে ওটাকে ঢুকিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াতেই হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। সেই কাছিমটা ফিরে আসছে। পাঁচিলের বাইরের মাঠে বোধহয় আবার নামল ওটা, কারণ আড়াল থাকায় সুবিমল এই মুহূর্তে দেখতে পেল না আর। ওরা চাকাটাকে খুঁজতে এসেছে। নিশ্চয়ই আলোর সিগন্যালিং-এ বুঝতে পেরেছে জিনিসটা এই চত্বরেই রয়ে গেছে। যদিও এখন চাকা সম্পূর্ণ মৃত কিন্তু ওরা সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করবেই। হয়তো কোন জিনিষ হারানো ওদের দেশে অমার্জনীয় অপরাধ। সুবিমলের মনে হল চাকাটাকে কাঠের বাক্স থেকে বের করে দৌড়ে এই বাড়ি থেকে চলে যায়। তারপরেই সে মাথা নাড়ল, কয়েক মাইলের মধ্যে যখন লোকবসতি নেই তখন সে কতদূর যেতে পারবে? বরং কাঠের বাক্স ওরা খুঁজে নাও পেতে পারে। তার চেয়ে লুকিয়ে দেখা যাক ওরা কী করে।

উঠোনের পাশে একটা আড়াল খুঁজে নিল সুবিমল। আর তখনই পাঁচিলের ওপর আলোকিত চাকাটা ভেসে উঠল। ওরা তন্ন তন্ন করে মাঠের ভেতরটা দেখছে। সুবিমলের মনে হল চাকার ভেতরে দুটো বেমানুষ রয়েছে। কারণ চাকাটার ভেতরে তেমন খালি জায়গা নেই। পাঁচিল ডিঙিয়ে ওটা এপাশের উঠোনে নামল। তারপরেই চাকা থেকে বেরিয়ে এল বেমানুষ দুটো। ওরা উঠোনটা ভাল করে দেখতে লাগল। সুবিমলের ভয় করছিল। যদি ওরা উঠোনের এপাশে চলে আসে তাহলে তাকে খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগবে না। তাই নির্জন রাত্রে তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ওদের বুঝতে অসুবিধে হবে না চাকাটা তার কাছেই রয়েছে। কী করা যায় প্রথমে ঠাওর করতে পারছিল না সে। ওই খুদে বেমানুষগুলো যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অতএব পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। তার চেয়ে সে খুব নিরীহ, এসব কিছুই জানে না এমন ভাব দেখালে কেমন হয়! অসহায় মানুষ দেখলে ওদের মায়া হতে পারে। কোন

জিনিস খোয়া গেলে রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুবিমল দ্রুত আড়াল ছেড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করল। এর মধ্যেই আবার হাওয়া গরম হয়ে গিয়েছে, বাড়িটাও তাতছে।

সুবিমল দৌড়ে দ্বিতীয় ঘরটায় চলে এল। তারপরে চুপচাপ তক্তাপোষের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল, যেন সে অনেকক্ষণ আগেই ঘুমুচ্ছে। মিনিট পাঁচেক গিয়েছে কি যায়নি, বাইরেটা আলোকিত হয়েই মিলিয়ে গেল আলো। কিন্তু সুবিমলের মনে হল ওরা পাশের ঘরে, এসেছে। আর তারপরেই ভেজানো দরজা খুলে গেল। কাঠ হয়ে শুয়েছিল সুবিমল দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছিল সে। সমস্ত শরীর এই উত্তাপেও ঠাণ্ডা।

ঘরের মেঝেতে একটা ধাতব শব্দ শুনতে পেল সে। ঠুন ঠুন করে সেটা এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়াল। তারপরেই আবার শব্দটা ছুটে গেল দরজার দিকে। চোখ খুলতে সাহস পাচ্ছিল না সুবিমল। হঠাৎ ঘরটা আলোকিত হয়ে গেল। এত আলো যে চোখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও চোখের পাতায় সেটা অনুভব করা যায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপরেই শব্দ হতে লাগল ঘরের মধ্যে। যেন জিনিষপত্র সরিয়ে সরিয়ে দেখা হচ্ছে। সেটা চুকে গেলে সুবিমলের মনে হল এর পরে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলে ওদের সন্দেহ হবে যে সে ইচ্ছে করে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। অতএব এখন সত্যের মুখোমুখি না হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কপালে যা আছে তাই হবে। সে ইচ্ছে করে একটা অস্ফুট শব্দ করতেই চট করে ঘরের সব আওয়াজ থেমে গেল। ঝট করে উঠে বসে তাকাতেই সুবিমল দেখতে পেল ওদের।

ওরা মানুষ নয়, বেমানুষ বলতেও এখন ইচ্ছে করছে না। চারফুটের নিচেই উচ্চতা, গোল মোটা নলের মত শরীর, সরু সরু হাত পা যদিও তার পাতা নেই, মাথায় চকচকে হেলমেট। তার তলায় যে গর্ত সেটা কি চোখ। দুজনেই খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে

স্থির হয়ে রয়েছে। যে সাহসটুকু সঞ্চয় করে উঠে বসেছিল সুবিমল সেটা মুহূর্তেই উবে গেল। বেমানুষ দুটো নড়ছে না, যেন স্থির চোখে তাকে লক্ষ্য করছে। সুবিমল কথা বলার চেষ্টা করল, মুখ থেকে একটা গোঙানি ছাড়া কিছু বের হল না। হঠাত একজন হাত তুলতেই সরু টর্চের আলোর মত একটা রশ্মি বেরিয়ে এল সেখান থেকে। রশ্মিটা সোজা তক্তাপোষের একটা কোণায় পড়তেই সেটা ছাই হয়ে ঝরে গেল। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল সুবিমল। অত মোটা কাঠের একটা অংশের একটুও সময় লাগল না ঝরে পড়তে। ওর মনে হল বেমানুষটা তাকে সতর্ক করল ওই ভাবে। সুবিমল আর নড়তে সাহস করল না। তবু শেষ সাহসটুকুকে হাতড়ে নিয়ে বলল, 'আপনারা কে ?' গলায় কাঁপুনি থাকা সত্ত্বেও কথাটা বলতে পাবল সে। কিন্তু কোন জবাব এল না ওপাশ থেকে। শুধু আর একবার হাতটা উঠল এবং তক্তাপোষের উলটোদিকের কোণাটা ছাই হয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল। এবাব নড়বড়ে হয়ে গেল তক্তাপোষটা। মেঝেতে নামতে সাহস হচ্ছিল না সুবিমলের। সে হাত জোড় কবে বলল, "এবকম কবছেন কেন, আপনারা কে ?"

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত দৃশ্য দেখল সুবিমল। যে বেমানুষটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল তাব বুকের কাছে নলেব একটা অংশ যেন পাঁই পাঁই কবে ঘুরতে লাগল। অন্য বেমানুষটি যে তক্তাপোষের দুই পাশ পুড়িয়েছে সে এখন স্থির। হঠাৎ এই ঘবে নিজের গলা শুনতে পেল সুবিমল, "এরকম করছেন কেন, আপনারা কে ?" আর তখনই পাইপের ঘুর্ণি থেমে গেল আচমকা। নিজের গলা এভাবে শূন্যে বাজতে যে চমকটা লেগেছিল সেটা টেপরেকর্ডারের কথা মনে আসতে কমে গেল। তবে রেকর্ড করার কোন যন্ত্র চোখে পড়ছে না। এবার দ্বিতীয় বেমানুষটির বুকের নলটা সামান্য আগুপিছু হয়ে স্থির হয়ে যেতেই সুবিমল লক্ষ্য করল দুটো বেমানুষের গঠনের মধ্যে বেশ প্রভেদ রয়েছে।

এই সময় দ্বিতীয় বেমানুষটি স্পষ্ট প্রশ্ন করল, তুমি কে ?"

"আমি সুবিমল, বঙ্কিমবাবু এই বাড়ি আমাকে দিয়ে গেছেন।"

"কতক্ষণ এই ঘরে আছ ? কতদিন ?"

"আমি গতকাল এসেছি, আজ সারাক্ষণ ছিলাম।"

"গতকাল আমাদের দেখেছ ?"

"হ্যাঁ, একটুখানি।"

দ্বিতীয় বেমানুষটি প্রথম বেমানুষের দিকে সামান্য ঘুরল। প্রথম বেমানুষটি মাথা নাড়ল। এবার দ্বিতীয় বেমানুষ জিজ্ঞাসা করল "তুমি কি ওই মাঠে গিয়েছিলে ?"

অস্বীকার করবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য সত্যি কথা বলা মানে বিপদ ডেকে আনা। সে মাথা নাড়ল, "মাঠে আমি যাব কেন ? আমি সন্ধে থেকে এই ঘরে ঘুমিয়ে আছি।"

"তুমি সত্যি কথা বলছ না। তোমার মস্তিষ্কের নার্ভগুলো মোচড় খেয়েছে। আমার সঙ্গী অত্যন্ত বদরাগী। সে এটা টের পেলেই হাত তুলবে।" দ্বিতীয় বেমানুষটি স্পষ্ট বলল।

মস্তিষ্কের নার্ভ মোচড় খেয়েছে ? সুবিমল এবার তাজ্জব হয়ে গেল। তার মাথার ভেতর কী হয়েছে সেটা এই বেমানুষ কী করে দেখবে ? স্রেফ ভড়কি দিয়ে কথা বের করার মতলব নয় তো ? ওই গর্তে লুকিয়ে ছিল সে সেটা ওর জানার কথা নয়। সুবিমল মাথা নাড়ল, "আমাকে বিশ্বাস করো।" দ্বিতীয় বেমানুষটি ঈষৎ রাগত গলায় বলল, "তুমি কোন গর্তে লুকিয়েছিলে ?"

সুবিমল তোতলালো, "মানে ?"

"এইমাত্র তুমি গর্তে লুকোবার দৃশ্য ভাবলে। তুমি সত্যি কথা না বললে আমি সঙ্গীকে বলতে বাধ্য হব।" সুবিমল জিভ চাটল, "তোমার সঙ্গী আমার কথা বুঝতে পারছ না ?"

"না। কারণ ও শব্দতরঙ্গ মিলিয়ে নেয়নি। বেশি সময় নেই আমাদের, সত্যি কথা বলো"। সুবিমল এবার অসহায় চোখে

তাকাল। সে যা চিন্তা করছে তাই ও বুঝে নিচ্ছে। অন্তর্যামী ? একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারো এই ক্ষমতা থাকার কথা নয়। এরা সেই ক্ষমতার অধিকারী ?

দ্বিতীয় বেমানুষ প্রশ্ন করল, "ভগবান কে ?"

সুবিমল ঘাবড়ে গেল, "যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, হয়তো আপনাদেরও তিনি সৃষ্টি করেছেন।"

"মূর্খের মতো কথা বলো না। এবার স্পষ্ট উত্তর দাও, আমাদেব দ্বিতীয় উপযানটি কোথায় ?"

"উপযান ? আমি জানি না।" সুবিমলের কথা শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় বেমানুষটি প্রথমের দিকে ইঙ্গিত করতেই সে হাত তুলল। এবার সুবিমল ধপাস করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। অর্ধেক তক্তাপোষ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সে বুঝতে পারল আর কোনো উপায় নেই। এবার অস্বীকার করলে তার অবস্থা ওই তক্তাপোষের মতো হয়ে যাবে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই দ্বিতীয় বেমানুষটি খুশী গলায় বলল, "তুমি স্বীকার করবে ভেবেছ বলে খুশী হলাম।"

"হ্যাঁ, আমি মাঠে গিয়েছিলাম।"

"আমাদের প্রধান যানের মধ্যে তুমি ঢুকেছিলে ?"

"হ্যাঁ। ওই কাছিমেব মতো জিনিষটা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল।"

"তুমি জানো এইভাবে ঢোকার জন্যে কী শাস্তি পাবে ?"

"জানি না। কিন্তু সেই একই দোষ তোমরা করেছ। এই বাড়িতে না বলে ঢুকেছ।"

"এই বাড়ি পরিত্যক্ত ছিল।"

"মোটেই না। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম ওই কাছিমটাও পরিত্যক্ত।"

"তুমি বড্ড তর্ক করছ ? আমাদের দ্বিতীয় যানটিকে কোথায় রেখেছ ?"

"তোমরা তো সবই টের পাও, এটা পাচ্ছ না কেন ?"

ওটাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে তাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া তুমি ভুলেও ওই যানটির অবস্থানের কথা চিন্তা করছ না। তুমি যা ভাববে আমি তাই বুঝতে পারব কিন্তু যা ভাববে না তা বোঝা সম্ভব নয়। বলো কোথায় রেখেছ সেটাকে ?"

"আমি যদি না বলি ?"

"তাহলে আমাদের অসুবিধে হবে। প্রধান যান ফিরিয়ে দেবার সময় তার সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হয়। কিছু না থাকলে বিপদে পড়ব। তুমি যদি না বল তাহলে আমরা তোমাকে বলতে বাধ্য করব।"

"আমি যদি না চাই তাহলে মরে গেলেও বলব না। আমার জেদ খুব। কিন্তু বলতে পারি যদি আপনি আমার কয়েকটা কথার উত্তর দেন।" সুবিমল আবদারের ভঙ্গীতে বলল।

"কী কথা ? যা জিজ্ঞাসা করবে তাড়াতাড়ি করো, ভোরের আগেই ফিরতে হবে।"

"কেন ফিরতে হবে ভোরের আগে ?"

"সূর্যের কিরণে আমাদের যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সূর্য ওঠার আগেই আমরা তার নাগালের বাইরে চলে যাই। যা জিজ্ঞাসা করার তাড়াতাড়ি কর।"

"আপনারা কারা ?"

"তোমাদের চেয়ে উন্নত সৃষ্টি।"

"কোথায় থাকেন ?"

"আমাদের গ্রহে"।

"আপনারা কত উন্নত ?"

"যত উন্নত হলে তোমরা ভগবানের ক্ষমতা বিচার করতে পার।"

"সত্যি ? আপনারা মৃত মানুষ বাঁচাতে পারেন ?"

"আমাদের কাছে মৃত্যু বলে কিছু নেই। আছে ধ্বংস। তোমাদের শরীর পচনশীল নরম পদার্থে তৈরি। তাই তোমাদের সম্পর্কে আমাদের কোন আগ্রহ নেই।"

“বেশ। এত জায়গা থাকতে আপনারা এখানে রোজ আসেন কেন ?”

“এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।”

“পাশের ঘরে কী জন্যে ঢোকেন ?”

“আমি ঢুকি না। আমার সঙ্গীটি আকর্ষণ বোধ করে।”

“আপনারা তো দুজনেই এক, তাহলে আপনি কেন আকর্ষণ বোধ করেন না” ?

“আমরা এক নই। সে পুরুষ শ্রেণীর, আমি প্রকৃতির।”

“ও। কিসের আকর্ষণ।”

“গন্ধের। আমাদের জগতে গন্ধ নেই। কিন্তু এখানে ও ওই গন্ধটিকে আবিষ্কার করে রোজ ছুটে আসে। অনেক কথা হল, এবার আমাদের যান ফিরিয়ে দাও।”

“আপনি ওটা আমাকে দিতে পারেন না ?”

“না।”

“আপনি কি রোজ ইচ্ছে করেই এখানে আসেন ?”

“না। ওর জন্যে আসতে বাধ্য হই। কারণ আমাদের দুজনের দল নির্দিষ্ট।”

“ওই ছবিতে গন্ধ এল কী করে ?”

“তোমার আগে যিনি থাকতেন তিনি কিছু কারচুপি করেছেন।”

“ছবির মধ্যেই সেটা আছে ?”

“হ্যাঁ।”

সুবিমল এবার ভাবল যানটিকে ফেরত দেবে কিনা। কারণ ওই কাঠের বাক্স থেকে খুঁজে বের করতে হলে হয়তো ভোর হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সূর্যের আলোয় ওদের ফেরা সম্ভব হবে না। এই অন্যগ্রহের মানুষদের যদি দিনের বেলায় আটকে রাখা যায়। দ্বিতীয় বেমানুষটাও হেসে উঠল, “ধন্যবাদ। তুমি আমাকে সন্ধান দিয়ে দিয়েছ।” তারপর ইঙ্গিত করতেই প্রথমজনের সঙ্গে সে চাকাতে উঠে বসল। মুহূর্তেই শূন্যে উঠে চাকা দরজা দিয়ে বেরিয়ে

গেল। হতভম্ব ভাবটা কাটতেই মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল সুবিমল। অন্যমনস্ক হয়ে যানটার কথা ভাবতেই ও জেনে গেছে লুকোন জায়গার কথা। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই ছুটো যানকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দেখল সে। তারপর কাছিমের শরীর যাকে প্রথম যান বলেছিল উঠে গেল আকাশে মাঠ ছেড়ে। তখনও পূবের আকাশ লাল হয়নি। দূরে তারাদের ভিড়ে হারিয়ে গেল সেটা।

৮

স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটা। কাউকে বললে সে বিশ্বাস করবে না এমন ঘটতে পারে। সুবিমল তক্তাপোষের ছাইগুলো দেখল। এ-গুলো তো সত্যি। অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল সে। তার মনে হচ্ছিল আজ খুব অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেছে। যদি প্রথম বেমানুষটি তার দিকে হাত তুলত তাহলে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু যা হয়নি তা ভেবে লাভ নেই। এই দুটো বেমানুষ সত্যি ভগবানের মত ক্ষমতা রাখে। হাত তুললেই মৃত্যু, চিন্তা করলেই সেটা বুঝে যায়। ভগবান ছাড়া আর কী!

একসময় দিনের আলো ফুটল। আকাশে হালকা মেঘ। মিষ্টি রোদে ভেসে যাচ্ছে চারধার। সুবিমল ক্লান্ত দেহে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ধূ ধূ প্রান্তর পড়ে আছে পাঁচিলের ওপাশে। প্রান্তরটা একসময় নিচে বেঁকে গেছে। হঠাৎ তার মনে হল ওই বেমানুষরা আর এখানে আসবে না। যদি কাছিমের মত যন্ত্রটা ওই মাঠে আর না নামে তাহলে এমন করে উত্তপ্ত হবে না মাটি, আবার গাছগাছড়া জন্মাবে, পশুপাখি ফিরে আসবে। পৃথিবীর মানুষ হয়তো কোনদিনই রহস্য ধরতে পারবে না। ওরা আর আসবে না। কথাটা ভাবতেই ওর গন্ধটার কথা খেয়াল হল। মেয়ে-বেমানুষ বলেছিল পুরুষ-বেমানুষ ওই গন্ধের টানেই ছুটে আসতো। ছবিটাকে যদি এখান থেকে সরিয়ে ফেলা যায়। সুবিমল পাশের ঘরে ছুটে এল।

এখন কোন গন্ধ নেই। দিনের আলো ফুরোলে, অন্ধকার বাড়লে গন্ধটা ছবি থেকে বেরিয়ে আসে। মেয়ে-বেমানুষ এই গন্ধটা পছন্দ করে না। পুরুষটির জন্যে সে আসতে বাধ্য হয়।

সুবিমল ছবিটাকে লক্ষ্য করল। এই ছবির মধ্যেই বঙ্কিম-বাবু ওই গন্ধের উৎসটি রেখে গিয়েছিলেন। সে ছবিটাকে নামাল। ভারি ফ্রেম, ক্যানভাসের ওপর আঁকা, কিন্তু পেছনেও আড়াল আছে। সুবিমলের মনে পড়ল রাত্রে সে একটা জায়গায় গন্ধটিকে তীব্র হতে দেখেছিল। ভাল করে লক্ষ্য করতে সেখানে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র খুঁজে পেল সে। কোন দ্বিধা না করে সুবিমল ফ্রেমটাকে খুলে ফেলতেই অবাক হয়ে গেল। ভেতরের আড়ালে একটা খাঁজ মতন জায়গায় তালের আঁটির মত দেখতে কিছু আটকানো আছে। হাতে নিয়েও কোনো গন্ধ পেল না। এছাড়া ছবিতে অন্য কোনো বস্তু নেই যা থেকে গন্ধ বের হতে পারে। আঁটিটাকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সুবিমল গাড়ির হর্ন শুনতে পেল।

গেটের কাছে দারোগা দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুবিমলকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

"কী খবর ভাই ?"

"ভাল।"

"আপনাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন ? ঘুমাননি ?"

"না," সুবিমল হাসল, "সারারাত ভগবানের ভাইবোনের সঙ্গে কাটিয়ে ছিলাম।"

"মানে ?" বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন দারোগা, "এই প্রকৃতির রাজ্যের কথা বলছেন ? তা ঠিক। খোদ ভগবানের জায়গা। আপনার হাতে ওটা কী ?"

সুবিমল বস্তুটিকে দেখল একবার। তারপর বলল, "এটা কাল রাত্রে মাঠে কুড়িয়ে পেলাম। নিয়ে যান আপনি।"

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দারোগা বললেন, "কী করব এটাকে নিয়ে ?"

"ঘরে রেখে দেবেন। দিনের বেলায় কোন বিশেষত্ব নেই, রাত্রে সুগন্ধ ছাড়বে।"

"তাই নাকি! কোনো কোনো ফুল ওই রকম হয়,। ধন্যবাদ। শহরে যাবেন?"

"না। একটু ঘুমাবো এখন।"

দারোগা গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুবিমল। এখন সে নিশ্চিন্ত। আর কেউ এখানে হানা দেবে না। বাসযোগ্য হল এই চারধার। এখন স্নান করে কিছু খেয়ে টেনে ঘুম দিতে হবে।

বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে একবার মনে হল রাত্রে দারোগার কী হবে কে জানে গন্ধটা তীব্র থেকে তীব্রতর হলে। তবে দারোগা বলে কথা, ঠিক ম্যানেজ করে নেবেন।

দুইজন সন্ধানী

সারা রাত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হেঁটে ট্রেনটা যখন ওদের চক্রধরপুর স্টেশনে পৌঁছে দিল তখনও আকাশ জুড়ে তারা সেঁটে আছে, আলো ফোটার তোড়জোড় শুরু হয়নি। এই ভোর না হওয়া রাতে স্টেশনে লোকজন কম, টিকিট কালেক্টর পর্যন্ত দরজায় দাঁড়ায়নি। এখন শীতের মাঝামাঝি, বিহারের এই অঞ্চলটায় তার দাপট খুব। যদিও দুজনের সর্বাঙ্গ ওভার কোট আর মাফলারে মোড়া তবু একটা কাঁপুনি আসছে থেকে থেকে। দুজনের একজন বেশ লম্বা, প্রায় সাড়ে ছ'ফুট, নাকটা খাঁজার মত সামনে বাড়ানো। অন্যজন সাধারণ চেহারার, তবে মাথায় একটাও চুল নেই। দুজনেরই বাঁ হাতে ছোট ব্যাগ অন্য হাত ওভারকোটের পকেটে রাখা রিভলভারের হাতলে। রিভলভারের স্পর্শ ওদের শরীরকে রুম-হিটারের মতো গরম করে রাখে।

ঢ্যাঙা লোকটি বলল, "একবার থানায় ইনফর্মেশনটা দিয়ে গেলে ভাল হত না?" এই শীতের রাতেও স্টেশনের সামনে একটা দোকান খোলা থাকতে পারে এবং সেখানে একটা মানুষ নিজের মনে জিলিপি ভাজতে পারে চট করে ভাবা যায় না। টাক মাথার নজর এখন সে দিকে, বেশ ম্যাক্সি সাইজের জিলিপি, কলকাতায় দেখা যায় না। পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের করে সে এগিয়ে গেল দোকানদারের কাছে। দুটো জিলিপি শালপাতায় ধরে চাটতে চাটতে কাছে এসে গম্ভীর গলায় বলল, "এই জন্যে

তোমার প্রমোশন হল না চাকলাদার। প্রত্যেকবার তুমি রান্না করো আর সেটা খায় অন্যলোক। ইনফর্মেশন যখন আমাদের হাতে তখন কাজটা আমরাই হাসিল করব।

ঢ্যাঙা লোকটা যার নাম চাকলাদার সে অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছিল জিলিপি চাটা দেখে। এই গাঙ্গুলিটার সঙ্গে ওর কিছুতেই পটে না। এই কেসটা একসঙ্গে করার জন্য ওপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য নেই তাই আসা। দু'বছর ইনক্রিমেন্ট আটকে আছে, এফিসিয়েন্সি বার ক্রস হয়নি বলে। প্রমোশন অনেকদিন ডিউ তবু হচ্ছে না। ঠিক একই কেস গাঙ্গুলির। যেমন করে হোক কাজটা হাসিল করতেই হবে। কিন্তু গাঙ্গুলিটা যা পেটুক, একবার অফার পর্যন্ত করল না। অবশ্য করলে ও খেত না। হেভি ডায়েবেটিস আছে ওর। কিন্তু মুখ না ধুয়ে লোকে খায় কী করে? গম্ভীর গলায় সে বলল, "কিন্তু সে একা আছে কি না জানা নেই, ফোর্স নিয়ে গেলে হত না?"

চেটে চেটে জিলিপি খাওয়া যায় এই প্রথম দেখল চাকলাদার। খেয়ে দেয়ে দোকানদারের কাছ থেকে এক ভাঁড় জল চেয়ে বলল, "একাই আছে। দুজন দুটো রিভলভার নিয়ে খোলা মাঠে ওকে ধরব তার জন্য ফোর্স কী দরকার?"

জল খেয়ে পকেট থেকে দুটো নিমের দাঁতন বের করে একটা চাকলাদারকে দিয়ে গাঙ্গুলি বলল, "নাও, দাঁত মাজো, বাস আসার আগেই চা-ফা খেয়ে নাও। বুঝলে চাক, এই কেসটায় কাউকে ভাগ বসাতে দেওয়া হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোকামি।"

থার্মোমিটারের মতো নিমের দাঁতন মুখে পোরা গাঙ্গুলিকে পিট-পিট করে দেখল চাকলাদার। মাঝে মাঝে খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে গাঙ্গুলি তাকে চাকু বলে ডাকে। শুনলেই টংকরে মাথার মধ্যিখানে একটা শব্দ হয়। কিন্তু প্রথমবার যখন প্রতিবাদ করা হয়নি তখন এখন আর বলার কোনো মানে হয় না। নিমের দাঁতন মুখে পুরতেই প্যাঁক-প্যাঁক করে একটা বাস এসে হাজির হল

সামনে আর কষাটে রসে মুখ ভরে গেল। এতক্ষণ নজরে পড়েনি আশপাশের ছাউনি থেকে পিলপিল করে মদেশিয়া আর ওঁরাও সম্প্রদায়ের মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে এসে বাসটাকে ভরে ফেলল দুমিনিটে। ড্রাইভার সমানে হর্ণ বাজাচ্ছে আর সেই তালে গলা মিলিয়ে কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, "জলদি আও, জলদি আও!' ভোর হল।

বাসটাকে সামান্য নড়তে দেখে গাঙ্গুলি ছুটে গেল সামনে "অ্যা, টেবো যায়গা?" কণ্ডাক্টরকে ঘাড় নাড়তে দেখেই গাঙ্গুলি চিৎকার করে চাকলাদারকে আসতে বলে ঠেলেঠুলে বাসে উঠে পড়ল। চাকলাদারের মুখভর্তি নিমের রস কোনরকমে ফেলে সে চলতে থাকা বাসটার হাতল ধরল। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। একহাতে ব্যাগ অন্যহাতে ওভারকোট, বলা যায় না যদি রিভলভারটা পকেটমার হয়ে যায়। বেজায় ভিড় বাসটায়। এই বাস ছেড়ে দিতে কী ক্ষতি হত, ঝুঁলে থাকা মাথাটা ঘোরাল চাকলাদার। বাসের ছাদটা বোধহয় ছ'ফুটের বেশি নয়। দেহাতি লোকগুলোর কি শীত লাগে না, বেশিরভাগের শরীরে গরম জামা কাপড় নেই।

একটা জায়গায় বাস থামতেই কণ্ডাক্টর চেঁচাল, "লাস্ট বাস, লাস্ট বাস। রাঁচিসে বাস ইস্টাইক হো গয়া।" ঘাবড়ে গিয়ে চাকলাদাব অন্যদিকে মুখ ঘোরাতেই গাঙ্গুলিকে দেখে ফেলল। দুটো দেহাতি মানুষের উদ্বৃত্ত সিটে নিজেকে সেঁটে দিয়ে নির্বিকার মুখে দাঁতন করে যাচ্ছে। চোখাচোখি হতে নিমের রস ম্যানেজ করে গাঙ্গুলি বলল, "আমরা কি লাকি বল, বাসটা পেয়ে গেলাম।"

লাকি তো বটেই। বেশ আরাম করে সীটে বসে যাচ্ছ। ঘাড় গুঁজে দাঁড়াতে হচ্ছে না। লম্বা লোকের একটাই সুখ, ফ্রেস বাতাস নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। বাকি সব ঝামেলা। কি বিশ্রী তেতো কষাটে হয়ে আছে মুখটা। এই প্রথম নিমের দাঁতন মুখে পুরেছিল সে। টুথব্রাসের চেয়ে দাঁতন নাকি ভাল কিন্তু এখন তার

মনে হচ্ছে কতক্ষণ ভাল করে মুখ ধোবে। গাঙ্গুলির তো তাপ-উত্তাপ নেই। জিলিপি খেয়ে কেউ দাঁতন করে? চাকলাদার অনেকবার প্রতিজ্ঞা করা কথাগুলো মনে মনে আবার আওড়ে নিল, যেমন করে হোক কৃতকার্য হবেই এবং তার জন্য এই গাঙ্গুলিদের অভদ্র ব্যবহারে মন দেবে না।

অবিরত বিভিন্ন উপায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা পাহাড়ি পথে ছুটে চলছিল। হঠাৎ কণ্ডাক্টর চেঁচাল, "টেবো, টেবো হিলস।" তড়াক করে সোজা হতে গিয়ে চাকলাদারের মাথাটা ছাদে ঠুকে গেল জব্বর। গাঙ্গুলি ততক্ষণে সুড়ুত করে নেমে গিয়েছে নীচে। মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে চাকলাদার কোনরকমে বাস থেকে নামতেই বাসটা চলে গেল। গাঙ্গুলি বলল, "বেশ তো আড়াই ঘণ্টা বাসে চড়ে এলে, টিকিট কাটার কথা মনে ছিল?"

চাকলাদাব বলল, "আমরা অন ডিউটি, কণ্ডাক্টবকে কার্ড দেখিয়েছি, তোমারটাও বলে দিয়েছি।" গাঙ্গুলির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার, "ইশ তোমার মাথায় কি একটুও হাওয়া খেলে না? বাসশুদ্ধ লোককে জানিয়ে দিলে আমরা পুলিস। হয়ে গেল, যাকে ধরতে এসেছি সে যদি খবর পেয়ে যায়—।" যেন অ্যাসিড খেয়েছে এমন ভঙ্গি করল গাঙ্গুলি। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল চাকলাদার, ভয় কাটাতে চারধারে তাকিয়ে বলল, "জায়গাটা খুব রোমান্টিক।"

খানিক গজগজ করে গাঙ্গুলি এবার কাজে মন দিল। ওরা একটা ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে জঙ্গল পাহাড় অন্যদিকে অনেকটা ঢালু জমি কিছু বুনো গাছ নিয়ে পড়ে আছে। লোকজন চোখে পড়ছে না। অথচ টেবো হিলসে বেশ লোকজন থাকে এরকম ধারণা ওদের ছিল। চাকলাদার বলল, "এ কোথায় এলাম হে' জনমানবশূন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ মালভূমিতে।" গাঙ্গুলি ওর কথায় কান না দিয়ে হেঁটে চলে জায়গাটা জরিপ করতে লাগল। রাস্তার বাঁকে দুতিনটি চালা ঘর দেখা যাচ্ছে। তার

সামনে যারা বসে আছে তারা মানুষ তাতে সন্দেহ নেই। ফার্স্ট স্টেপ অফ অ্যাকশন, ওদের জেরা করলে কিছু ক্লু পাওয়া যাবে। একটা বাঙালি ছেলে এখানে বাস থেকে নামলে যে কোনো দেহাতি তাকে দেখবেই এবং নিজেরা তা নিয়ে গল্প করবে। অতএব ওদের জিজ্ঞাসা করা যাক। গাঙ্গুলিকে দ্রুত এগোতে দেখে চাকলাদার তার পিছু নিল। বুঝলে গাঙ্গুলি, "প্রথমে ভাল করে মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে নেওয়া যাক। টোস্ট পেলে মন্দ হয় না। নিমের রসে মুখটা—।"

"ছ্যাবলামি করো না। তুমি একজন পুলিস অফিসার, অত খাই-খাই কেন?" কথাটা বলতে বলতে গাঙ্গুলি যে ঢেকুরটা তুলল তাতে ফ্রেস জিলিপির গন্ধ, অম্বল হয়ে গেছে।

লোকগুলো কোন খবর দিতে পারল না। চাকলাদাব ভাবল, ব্যাটারা হিন্দিও ভাল করে বোঝেনা, গরিব, না খেয়ে খেয়ে মৃতপ্রায়। বেশির ভাগের পায়ে গোদ। গাঙ্গুলি ভাবল, একটা ষড়যন্ত্র চলছে নিশ্চয়ই। একটা লোক এখানে এসেছে আর এরা দেখেনি? বলা যায় না এরা হয়ত তাকে সাহায্য করছে। অথচ জেরা করেও কোনো কথা আদায় করা যাচ্ছে না। এখানে এরা বসে আছে কারণ বাড়ির মেয়েরা পাঁচ মাইল দূরে একটা ঝোর থেকে জল আনতে গিয়েছে। সেই জল এলে ওরা খাবে। এখানে নাকি জল পাওয়া যায় না।

চাকলাদার জিজ্ঞাসা করল, "হিঁয়া হোটেল হ্যায়?"

যে ওদের মোড়ল সে ঘাড় নাড়ল। যা বাবা! চাকলাদার আবার জিজ্ঞাসা করল, "চায়েকে দোকান? বলে হাতের মুদ্রায় বোঝাতে চাইল চা কী করে করে। না, এখানে চা-বিড়ি-সিগারেটের দোকান নেই। এখান থেকে আটক্রোশ দূরে টেবোতে ওসব পাওয়া যাবে। এতক্ষণে ওরা বুঝল টেবো হিলস্ আলাদা জায়গা। ওরা কি ভুল করে ফেলল? গাঙ্গুলি পকেট থেকে কাগজ বের করে দেখল সেখানে টেবো হিলসই লেখা রয়েছে। তবে? "দেশের অ্যাড-

মিনিস্টেশন এমন হয়েছে যে কারেক্ট ইনফর্মেশন কেউ দেবে না।" বেজার মুখে বলল সে।

তাহলে ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়াল যে ওরা মুখ ধুতে পারবে না, চা খেতে পারবে না এবং যেজন্য এখানে আসা সেই ছেলেটির কোন খবর পাচ্ছে না। এসব চিন্তা করতেই চাকলাদারের মনে হল তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সেই কাল সন্ধেবেলায় কলকাতায় শেষ জল পেটে পড়েছিল। অথচ জল নাকি পাঁচ মাইল না গেলে পাওয়া যাবে না। সারা রাত ট্রেন জার্নি তারপর এতদূরে বাসের ঝাঁকুনি খেয়ে আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। এখানে বসে থাকলে ওদের মেয়েরা যখন জল নিয়ে ফিরবে তখন একটু চেয়ে নেওয়া যেতে পারে, চাকলাদার নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে দেখল তার জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। গাঙ্গুলি ঘাবড়ে গেলেও প্রকাশ করছিল না। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো! অম্বল হওয়ায় ওর ক্ষুধা বোধটার এখন কাজ করছে না এই যা সুবিধে। আটক্রোশ রাস্তা ভেঙে টোবো গেলে সেই ছেলেটির পাত্তা পাওয়া যেতে পারে। ষোলো মাইল মানে গড়িয়াহাটা থেকে শ্যামবাজার যাওয়া আসা। কিছুই নয়। সে বলল, "নাও, মার্চ করো।"

"মানে?" হাঁ হয়ে গেল চাকলাদার।

"টেবোতে চলো। আজ বাস স্ট্রাইক, হেঁটেই যেতে হবে।" গাঙ্গুলি রাস্তাটার দিকে তাকাল। "ইম্পসিব্‌ল। জল না খেয়ে এক পাও হাঁটতে পারব না।" চাকলাদারের মুখ দিয়ে কথাটা বেরুতে খুশি হল গাঙ্গুলি, হাঁটতে তার ইচ্ছে করছিল না। সে মোড়লের দিকে ফিরে বলল, "ইঁহা রেস্ট হাউস মানে কোই বাংলো হ্যায়?"

লোকটা বুঝতে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। চাকলাদার শুকনো গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করল, "আরে ভাই ইধার কোই কুঠি হ্যায়?"

হলুদ দাঁত বের করে হাসল মোড়ল, তারপর একপাশে আঙুল

বাড়িয়ে জানাল ওদিকে একটা বড়কুঠিতে একজন বড়মানুষ থাকেন। গাঙ্গুলির কপালে ভাঁজ পড়ল, ওই জঙ্গলের মধ্যে যদি কেউ বাড়ি তৈরি করে থাকে তার মতলবটা কী? এই হতচ্ছাড়া জায়গায় যেখানে জলও পাওয়া যায় না সেখানে লোকটা থাকবে কেন? কেঁচো খুড়তে যদি সাপ বেরিয়ে যায়—গাঙ্গুলি উদ্দীপ্ত হল। এও তো হতে পারে যে ছেলেটিকে ওরা চাইছে সে ওই বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছে। চাকলাদারও ব্যাপারটা ভেবে ফেলেছে। ওরা আর কথা না বাড়িয়ে পিচের রাস্তা ছাড়িয়ে নীচে নামল।

দুপাশের জঙ্গলের মধ্যে একটা গাড়ি চলার পথ। চাকলাদার একটু ঝুঁকে মাটি দেখে বলল, "কাল রাতে একটা জীপ ভেতরে ঢুকেছে।"

গাঙ্গুলি বলল, "জীপ না অ্যাম্বাসাডার।"

"নেভার। জীপই।" ভারি চাকা আর এবড়ো খেবড়ো রাস্তা জীপ ছাড়া চলবে না।" অনেকক্ষণ পরে চাকলাদার গাঙ্গুলিকে এক হাত নিয়ে বলল, "রিভলভার রেডি রাখো। যার কাছে যাচ্ছি সে খুব ডেঞ্জারাস। একা এরকম জায়গায় থাকে যখন তখন নিশ্চই কীর্তন করে না।"

ওরা সতর্ক পা ফেলে হাঁটছিল। দুপাশের জঙ্গলে কোন পাখি পর্যন্ত নেই। কেমন নেড়া নেড়া গাছগুলো। এই সকাল দশটাতেই বেশ ছমছম করছে চারধার।

গাঙ্গুলি জিজ্ঞোসা করল, "কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবে?"

চাকলাদার বলল, "জল খেতে চাইব। একবার বসতে দিলে শুতে কতক্ষণ!"

গাঙ্গুলির মনে হল কোথাও যেন কেউ কথা বলছে। সে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে বিফল হয়ে বলল, "মারাত্মক জায়গা। জানিনা আমাদের ওপরে কেউ ওয়াচ রাখছে কিনা।"

চাকলাদার বলল, "এরকম জায়গায় বাড়ি থাকবে মনে হচ্ছে? লোকগুলো মানে বুঝতে পেরেছে তো?"

গাঙ্গুলি জবাব দিল না। ওর একটা হাত রিভলভারের বাঁটে, যে-কোনো মুহূর্তে ফায়ার করার জন্য সে প্রস্তুত। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকার প্রায় মাথার ওপর এমন আছড়ে পড়ল প্রথমে ওর শরীর হিম হয়ে গেলেও সামনে গিয়ে রিভলভার বের করে দেখল একটা বিরাট বাজ পাখি ওর দিকে তাকিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছে। চাকলাদার চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চিৎকার শুনে এবার চোখ খুলে পাখিটাকে দেখে বলল, "এরকম একটা পাখি গান্‌স অব নেভরোন এ ছিল।" গলায় এখনও কাঁপুনি আছে, "লোকটার এজেন্ট নয় তো? অরণ্যদেবে পড়েছি।" এবার পাখিটার ওপর রেখে গেল গাঙ্গুলি। গুলি করবে কিনা ভাবতেই সেটা উড়ে চলে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর জঙ্গলটা আচমকা হালকা হয়ে যেতেই ওরা হকচকিয়ে গেল। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে একটা রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল ওরা। বেশ উঁচু কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল একটা বাগান ঘেরা দোতলায় বাড়ি চুপচাপ দরজা জানলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। চাকলাদার ক্যাসকেসে গলায় বলল, "খুব বড়লোক মনে হচ্ছে।"

"ক্রিমিন্যাল।" চাপা গলায় জানাল গাঙ্গুলি "নইলে এই পাণ্ডব-বর্জিত জঙ্গলে কী ধান্দায় এই বাড়ি তৈরি করবে? নিশ্চয়ই গোপন কারবার আছে।"

চাকলাদার উৎফুল্ল হল এবার, "উঃ, এক ঢিলে দুই পাখি। পলাতক আসামী আর বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল গ্রেফতার। ভাবল প্রমোশন কে আটকায়!"

শুধরে দিল গাঙ্গুলি, "ক্রিমিন্যালরা বিখ্যাত হয় না, কুখ্যাত। বাংলাটাও জানো না? যাক এখন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। রিভলভার থেকে হাত সরাবে না।"

গেটটা লোহার কিন্তু তাতে তালা নেই। ওরা নিঃশব্দে সেটা

খুলে বাগানের পথে পা বাড়াল। চাকলাদার চার পাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল, "এসব বাড়িতে শুনেছি কুকুর থাকে। হাউণ্ড!" শুনেই থমকে গেল গাঙ্গুলি। নির্জীব গলায় বলল, "তুমি সামনে যাও, কুকুরে আমার অ্যালার্জি আছে।" চাকলাদার এটাই চাইছিল, যে আগে যায় সেই তো নেতা। কিন্তু বিরাট ভারি কাঠের সদর দরজা অবধি আসতে কোনো বিপদ ঘটল না। ওদের চার চোখ চারপাশে ঘুরছিল। একটা মানুষ দূরের কথা বেড়াল অবধি নেই। গাঙ্গুলি দরজায় টোকা মেরে ফিস-ফিসিয়ে বলল, পুলিসের লোক বলার দরকার নেই। বলবে টুরিস্ট।"

চাকলাদার ফিসফিসিয়েই উত্তর দিল, "টুরিস্টদের পকেটে কি রিভলভার থাকে?"

"আঃ তোমার পকেট সার্চ করতে গেলেই গুলি করবে। প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না।" গাঙ্গুলি এবার আরও একটু জোরে দরজায় আঘাত করল। না কেউ খুলছে না। শেষ পর্যন্ত দুজনে মিলে কিছুক্ষণ ঘুষি মারতেই আচমকা দরজা খুলে গেল। ওরা থতমত হয়ে দেখল একমাথা পাকা চুল অথচ বলিষ্ঠ গড়নের একটি সাঁওতাল মুখ বের করে জিজ্ঞাসা করল পরিষ্কার বাংলায়, "কে আপনারা?"

"গাঙ্গুলি গম্ভীর গলায় বলল, "টুরিস্ট, বেড়াতে এসেছি। বাড়িতে কে আছে?"

"আমি আর বাবু।" লোকটার চোখে বিস্ময়। বাবু মানে এই লোকটা তাহলে চাকর।

গাঙ্গুলি হুকুম করল, "বাবুকে খবর দাও।"

"তিনি ঘুমুচ্ছেন। এখন উঠবেন না।" চাকরটিকে খুব সজ্জন মনে হচ্ছে না চাকলাদারের। ওকে যদি নিজেদের পরিচয় দেওয়া যায় তাহলেই চেহারা পালটে যাবে। সে কথা বলল,

"বলো যে খুব জরুরি দরকার।"

"সে হবে না। বাবুর মনের জিনিস ছাড়া আর কেউ এলে ডাকা

নিষেধ। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আর অত জোরে শব্দ করবেন না, কাঁচা ঘুম ভেঙে যাবে।" চাকরটি মুখ ঢুকিয়ে নিচ্ছিল, চাকলাদার তাকে থামাল, "আরে দরজা বন্ধ করছ যে। আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে না?"

"বাবুর নিষেধ আছে।" দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। শেষে চাকলাদার বলল, "পুলিসের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল?" তোমার যেমন বুদ্ধি, টুরিস্ট পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, এখন বোঝ।"

উত্তেজনা কমে এলে ওদের মনে পড়ল সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি এমনকি মুখও ধোওয়া হয়নি। এখন বেলা প্রায় বারোটা। এ-সময় একটা লোক যদি ঘুমোয় তবে সে জাগবে কখন? চাকলাদার আবার দরজায় শব্দ করতে যাচ্ছিল কিন্তু গাঙ্গুলি বাধা দিল। লোকটাকে বিগড়ে দেবার দরকার নেই, বড় বড় গোয়েন্দারা মরুভূমি পাহাড় পেরিয়ে হত্যাকারী ধরতে যায় এ তো শুধু একবেলা উপোস। খিদে পেলে সব কিছু অসহ্য লাগে চাকলাদারের কাছে কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল লোকটা বাবুর একটা সখের কথা বলেছিল। সখের জিনিস এলে নাকি অসময়ে ঘুম ভাঙানো চলে। কী জিনিস সেটা? কোনও চোরাই সোনা না গাঁজা আফিম ও গাঙ্গুলিকে পয়েন্টটা বলল না। বাইরের রোদটা বেশ ভালই কিন্তু আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ওরা দুজন দরজার পাশে উঁচু সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে জিরোতে লাগল। চাকলাদার একবার ভাবল বাড়ির পেছন দিকটায় একজন পাহারায় থাকলে বোধহয় ভাল হবে। লোকটার কোনও মতলব থাকলে ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু একা থাকতে ঠিক সাহস হচ্ছে না। খিদে তৃষ্ণা যে ঝিমুনি এনে দেয় একথা জানা না থাকায় ওদের চোখ যখন খুলল তখন চাকরটা সামনে দাঁড়িয়ে। রোদের তেজ এখন নেই। ছায়া নেমেছে বাগানে। চাকরটা বলল, "এবার বাবু আপনাদের ডাকছেন। তাঁর ঘুম ভেঙেছে।" সমস্ত শরীরে অবসাদ থাকলেও ওরা চট করে

উঠে দাঁড়াল। গাঙ্গুলি চাপা গলায় বলল, "কথা যা বলার আমিই বলব, তুমি ওয়াচ করবে।"

সতর্ক পায়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। ছোট হলঘরের মাঝখানে একটা সমবাইকা সাঁটা লম্বাটে টেবিলের ওপাশে যে লোকটি বসে আছেন তাঁর বয়স ঠাওর করা মুস্কিল। পঞ্চাশের ওপাশে হওয়া বিচিত্র নয়। অসম্ভব রোগা, গিলেকরা পাঞ্জাবি আর ফর্সা মুখে একটা স্টেইনলেশ ফ্রেমের চশমা দেখতে পেল ওরা। একটু কৌতূহল ছাড়া সে মুখে কিছু নেই।

গাঙ্গুলি নমস্কার করে বলল, "আমরা ট্যুরিস্ট, এখানে বেড়াতে এসে বিপদে পড়েছি। দেহাতিঁদের মুখে আপনার কথা শুনে একটু সাহায্যের জন্য এলাম।"

লোকটা পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, "সাহায্য, কীরকম?" অসম্ভব মেয়েলি গলা।

গাঙ্গুলি বলল, "আমরা ফার্স্ট বাসে নেমে দেখলাম এখানে জল নেই। আজকে আবার বাস স্ট্রাইক হয়ে গেছে। সকাল থেকে আমরা-মানে অভুক্ত—"

"আ। এখানে কেউ বেড়াতে আসে বলে শুনিনি। রাস্তায় হাঁটলেই গোদ হয়।" ভদ্রলোক হাসলেন।

"গোদ?" চাকলাদার মুখ ফসকে বলে ফেলে অন্যদিকে তাকাতেই মনে হল ওর শিরদাঁড়া নেই, এখনই ধপ করে পড়ে যাবে। মুখ বিস্ফারিত কোনও শব্দ বেরুচ্ছে না, চোখ দুটো যখন ধাতস্থ হল তখন সে আবার ফিরে ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনার উচ্চতা কত?"

চাকলাদারের কথা বলার আগেই গাঙ্গুলি জবাব দিল, "ছ'ফুট সাত ইঞ্চি।"

ভদ্রলোক হাসলেন, "ভাল, ভাল, বাঙালিদের এতটা বাড়তে দেখা যায় না। তা আপনাদের কী দরকার? জল, কিছু খাবার আর রাত্রের জন্য আশ্রয়? পাবেন। রক্তমাংসের বাঙালি মুখ

দেখতে সচরাচর পাইনা, সেই চক্রধরপুর যেতে হয়। এখন আমি একটু কাজকর্ম করব। ডিনারের সময় দেখা হবে।” চাকরকে নির্দেশ দিয়ে ভদ্রলোক যখন উঠে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তখন ওঁকে সর্বাঙ্গে দেখা গেল। খুব জোর চারফুট দশ ইঞ্চি হবেন কিনা সন্দেহ।

এতক্ষণে চাকলাদার গাঙ্গুলিকে ইঙ্গিত করতে পারল। একটা চাপা আর্তনাদ করেই গাঙ্গুলি চাকলাদারের হাত চেপে ধরল। ঘরের কোণায় একটি চারফুট উচ্চতার কঙ্কাল দুহাতে একটা ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার ওপর কতগুলো গ্লাস রাখা হয়েছে। চাকরটি হেসে বলল, “ওর নাম টিস্‌কু। দু’মাস হল এসেছে। চলুন আপনাদের ঘর দেখাই।”

একটা কঙ্কালের নাম টিস্‌কু এবং সে ঘরে ওই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে? ওরা মুখ চাওয়াচায়ি করে ধাতস্থ হল। গাঙ্গুলি চাপা গলায় বলল, “ডেঞ্জারাস প্লেস।”

চাকরটার পেছন-পেছন ওরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই চাকলাদার চিৎকার করে উঠল আচমকা। সিঁড়ির মুখে একটা মাঝারি সাইজের কঙ্কাল বিরাট মোমবাতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাকরটি বলল, “ওটাতো কঙ্কাল বাবু, ভয় পাওয়ার কী আছে।”

ঘর দেখিয়ে দিয়ে চাকর চলে গেলে গাঙ্গুলি বলল, “বিরাট একটা ক্রাইম এই বাড়িতে ঘটছে ঠাণ্ডা মাথায় সল্‌ভ করতে পারলে ডবল প্রমোশন, মনে রেখো চাকু।”

চাকলাদার বলল, “কিন্তু কঙ্কাল দেখলেই মনে হয় মরে গেলে আমি ওরকম হব।”

“সাধনা করতে গেলে অমন বাধা আসবেই।” মাতব্বরের মতো বলল গাঙ্গুলি, “যাক, এই ঘরটা ভালই, ওপাশে বোধহয় শোওয়ার ঘর। এদিকে বাথরুমের দরজা দেখছি। যাই আমি আগে পরিষ্কার হয়ে আসি।” গাঙ্গুলিকে পাশের দরজা দিয়ে

ভেতরে চলে যেতে দেখল চাকলাদার। এখনও তার শরীর ঝিমঝিম করছে। দু'দুটো কঙ্কাল রেখেছে বাড়িতে লোকটা? বেঁটে রোগা কিন্তু চাহনিটা কেমন হিলহিলে, রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এ-বাড়িতে কটা লোক আছে জানতে হবে। নিশ্চয়ই গুপ্তঘরে প্রচুর গুণ্ডাটাইপের কর্মচারী থাকবে। গাঙ্গুলিকে টপকে যদি আগে-ভাগে— , এই সময় পাশের ঘরে গাঙ্গুলির গোগানি শুনে এক দৌড়ে চাকলাদার সেখানে ছুটে গেল। ঢোকার সময় রিভলভার উঁচিয়ে ধরেছে সে। গাঙ্গুলির চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাঁ করে চৌবাচ্চার ওপর রাখা একটা খুলির দিকে তাকিয়ে আছে। চাকলাদার ব্যাপারটা দেখে কোনওরকমে নিজেকে সামলালো। মগের বদলে ওই খুলি করে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলতে হবে। চাকলাদারকে দেখে গাঙ্গুলি তর্জনি তুলে কোনওরকমে সেটাকে দেখাল। চাকলাদার ফিসফিসিয়ে বলল, "মৃত্যুপুরী, সর্বত্র মৃত্যুর চিহ্ন ছড়ানো, ভাই গাঙ্গুলি, আমি আর পারছি না।" চাকলাদারকে দেখে গাংগুলি সামলে নিল নিজেকে। তারপর দ্রুত হাতে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিল। একটা কিছু ছাড়া ওভাবে জল তুলতে অসুবিধে হল চাকলাদারের কিন্তু প্রয়োজনে সবই সম্ভব হয়। এতক্ষণ নিজের কথাটে ভাবটা জিভ থেকে যাওয়ায় মেজাজ স্থির হল। স্নান করা গেল না অবেলা বলে কিন্তু ফ্রেস লাগছে বেশ। বাথরুমে দাঁড়িয়ে গাঙ্গুলি বলল, "মনে রেখো, একজন নার্ভাস হলে আর একজন সামলে দেবে। দুজনে একসঙ্গে যেন কখনো নার্ভাস না হই।"

চাকলাদার খিঁচিয়ে উঠল, "সেটা কি আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে? খুলির তালুটা কীরকম গোল দ্যাখো যেন হাতির দাঁতের মতো। এটা দেখে অবশ্য ভয় পাওয়া ঠিক।"

এইসময় বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ওরা বেরিয়ে এসে দেখল চাকরটা একটা বড় ট্রেতে বেশ কিছু সন্দেশ বিস্কুট আর চা নিয়ে এসেছে। ওরা আর দ্বিধা না করে চেয়ারে বসে সেগুলো

সৎকারে মন দিল। এরকম জায়গায় এত টাটকা সন্দেশ কী করে পাওয়া যাচ্ছে—চাকলাদার একবার চিন্তা করে চাকরটার দিকে তাকাতেই সে বলল, "সন্ধে হয়ে যাচ্ছে বাবু, আলো জ্বেলে দিয়ে যাই ঘরে। আপনারা বাইরে না বসে মশারির ভেতরে ঢুকে যান। মশা নয় তো চড়ুই পাখি।"

গাঙ্গুলি বলল, "তুমি তো বেশ ভাল বাংলা বলো তো হে।"

চাকরটা মুচকি হেসে পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। চাকলাদার গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বলল, "সব কিছু রহস্যময়। এরকম টাটকা সন্দেশ, কঙ্কাল কী করে পেল লোকটা? ওকে সুযোগ না দিয়ে এক্ষুনি সার্চ করলে কেমন হয়?"

চায়ে চুমুক দিয়ে গাঙ্গুলি বলল, "ওয়ারেন্ট কোথায় যে সার্চ করব?"

এবার চাকলাদার মেজাজ দেখাল, "তখনই বলেছিলাম থানায় খবর দিয়ে চলো। এখন বোঝ।"

চাকরটা ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে খালি কাপ প্লেট নিয়ে যেতে ওরা উঠে দাঁড়াল। সারাদিন কম ধকল খায়নি। শোয়ার ঘরে ঢুকল চাকলাদার। একটু অন্যমনস্ক হয়ে কয়েক পা হেঁটে মুখ তুলতেই তার হাত-পা কাঁপতে লাগল। মুখ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হবার আগেই শরীরের হাড়গুলো নড়চড়ে হয়ে গিয়ে সে মেঝের ওপর ভেঙে পড়ল। গাঙ্গুলি পেছন পেছন আসছিল, সামনের দিকে তাকিয়েই সে চট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর সেই অবস্থায় কোনও রকমে বিকৃত গলায় বলে উঠল, "চাকু!" কোনও সাড়া নেই চাকলাদারের কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না তার। একবার যা দেখেছে সেটা এখন বন্ধ চোখের অন্ধকারে তিড়িং তিড়িং করে নাচছে। একটা কঙ্কালের মাথার ওপর বিরাট মোমবাতি জ্বলছে আর তার আলোয় সেটাকে এমন জ্যান্ত দেখাচ্ছে যে হৃদ্‌পিণ্ডটা গলার মধ্যে ছিটকে আসে। চাকলাদারকে পড়ে যেতে দেখছে সে। কোনওরকমে দু পা

হাঁটতেই তার শরীর পায়ে ঠেকল। উবু হয়ে বসে প্রাণপণে বিরাট শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে জ্ঞান ফেরাল গাঙ্গুলি। তখনও চোখ খোলেনি সে। চাকলাদার চেতনা আসতেই গাঙ্গুলিকে জড়িয়ে ধরল, "চ-চ-চল, পালাই।"

এই সময় ঘরের ভেতর একটা কাক্কুরুক সুন্দর স্বরে ডেকে উঠল, ছটা বাজছে। গাঙ্গুলি বলল, "আলোটার দিকে না তাকিয়ে চোখ খোল চাকু। ভয় করলেই ভয় নইলে কিছুই নয়।"

অনেকটা সময় লাগল নিজেদের সামলে নিতে। ওরা যখন উঠে দাঁড়াল তখনও হাঁটু কনকন করছে, সারা শরীরে ঘাম। গাঙ্গুলি সাহসটাকে ফিরিতে আনতে পায়ে পায়ে কঙ্কালের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আরে ব্বাস, দ্যাখো চাকু এটাকে একটা কাঠের সঙ্গে ফিক্সড করে রাখা হয়েছে যাতে পড়ে না যায়। তার মানে এটা ইউসলেস লেখা, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" সাহসী মুখে সে হাসতেই ওপাশের বিছানাটা দেখতে পেল। দুজনের শোওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু খাটে। চারপাশে চারটে কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ওদের আঙুলের ডগায় মশারির ফিতে বাঁধা। যেন চারজনে মশারিটা ধরে আছে ভদ্রতা করে। ঠিক সেই সময় ঠাস করে একটা মশা মারল গালে, 'একে এইসব, তারপর কী বিরাট মশা। হায় ভগবান!' গাংগুলি আর একবার মশারির দিকে তাকিয়ে গুটিগুটি পায়ে চাকলাদারের পাশে হেঁটে এল, "লোকটা হয় পাগল নয় আমরা পাগল হয়ে যাব। তাকিয়ে ছাখ, চারটে কঙ্কাল মশারি ধরে দাঁড়িয়ে আছে।" ভয় পেতে পেতে মানুষের নার্ভ এমন একটা জায়গায় চলে যায় যখন আর কিছুই তাকে নাড়া দিতে পারে না। চাকলাদারের এখন সেই অবস্থা। সে অসহায় চোখে বিছানাটা লক্ষ্য করে বলল, ওখানে শোব কী করে?

গাঙ্গুলি বলল, "মশার হাত থেকে বাঁচতে ওছাড়া উপায় নেই।

তাছাড়া ওগুলোতে খাটের সঙ্গে ফিক্সড্ করা। ভয় পেয়ো না চাকু এখন ঠাণ্ডা মাথায় প্রত্যেকটা পয়েন্ট আলোচনা করা যাক।" রিভলভার হাতে নিয়ে সে বিছানায় গিয়ে বসতেই অনেকটা দোলা লাগল শরীরে। বেশ স্পঞ্জও আছে গদিতে, রাজসিক ব্যাপার। চারজন মানুষ আমাদের মশারি ধরে থাকবে সারারাত। এসো চাকু।" চাকলাদার খুব সতর্ক পায়ে বিছানায় এসে বসল। সে কোনও দিকে না তাকিয়ে বলল, কঙ্কাল আর মানুষ এক হল?"

ঠিক সুস্থ মাথায় আলোচনা করা যাচ্ছে না, কারণ প্রচণ্ড মশা আর শীতটাও বেশ জেঁকে আসছে। কোনওরকমে মশারিটা ফেলে দিতে চারধারে বেশ ফিনফিনে পাঁচিল ওদের আড়াল করল। ওরা দেখল, লোকটা মানে এই বাড়ির মালিক অত্যন্ত ধূর্ত কারণ সারাদিন তাদের বাইরে বসিয়ে রেখেছে, বেশিক্ষণ কথা বলেনি এবং বলার ভঙ্গি সুবিধের নয়। বাড়িময় এত কঙ্কাল ছড়ানো যা স্বাভাবিক কোনও মানুষ রাখতে পারে না। নিশ্চয়ই খুনটুন করে লোকটা। কিন্তু এত খুন একটা মানুষ কীভাবে করে সেটা ওদের মাথায় ঢুকছিল না। আর করবেই বা কেন? এইসব ভাবতে ভাবতে ওদের নরম বিছানায় বসে ঝিমুনি এসে গেল।

আটটা নাগাদ চাকরটা এসে ওদের ডেকে নীচে নিয়ে এল। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। রুটি, মাংস আর সন্দেশ। ঘুমের চোখ থাকায় নেমে আসতে অসুবিধে হয় নি এখন ভদ্রলোককে দেখে ওদের আচমকা সব মনে পড়ে গেল। চাকলাদার দেখল একটা কঙ্কালকে সাদা চামড়া পরালে ওর মতো দেখাবে। একটু হোঁচট খেয়ে সে খাবারে হাত দিল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

গাঙ্গুলিকে ঘাড় নেড়ে না বলতে দেখে চাকলাদার অবাক হল। সে আর থাকতে না পেরে বলে বসল, "আচ্ছা, আপনার বাড়িতে এত কঙ্কাল কেন?

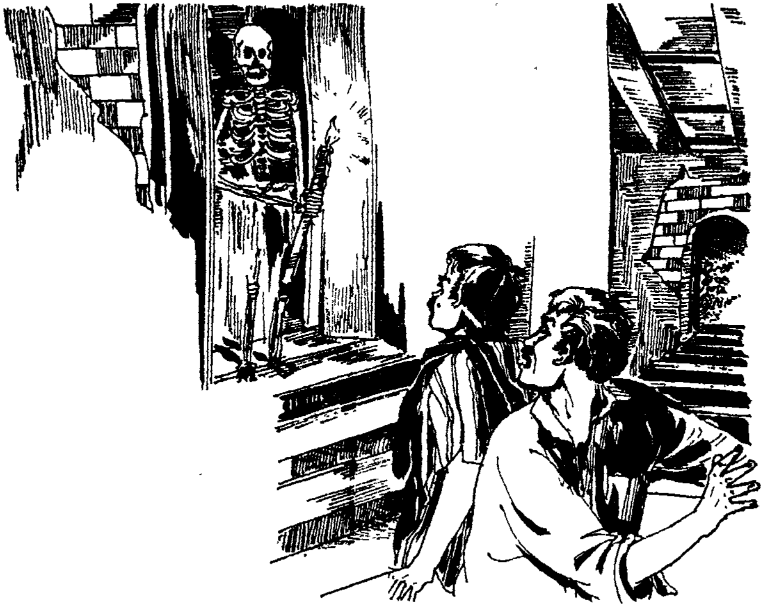

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "কঙ্কাল বলবেন না। ওরা অস্থিপঞ্জর। কঙ্কাল শব্দটায় একটা ভূতড়ে গন্ধ আছে। কেমন দেখলেন? আপনারা যে ঘরে শুয়ে ছিলেন সেখানে যে অস্থিপঞ্জর মাথায় আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন।"

গাঙ্গুলি ক্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েছেলের কঙ্কাল অস্থিপঞ্জর?"

ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক, "হ্যাঁ। আমার সংগ্রহে এখন পর্যন্ত একশো তিনটে আছে। এদেশে ওদের যোগাড় করা খুব ডিফিক্যাল্ট। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পার্সোনাল কালেকশন রোডেশিয়ার মিষ্টার বার্কলের, দুশো তিরিশ। কতরকমের স্পেসিমেন আছে যার সব আমি এখনও পাইনি। যেমন ধরুণ, তিনফুট উঁচু বামনের। বাচ্চা ছেলের অস্থিপঞ্জর বামন বলে চালানো যায় না। আবার সাড়ে ছয়ফুট লম্বা অস্থিপঞ্জর আমার নেই।" ভদ্রলোকের হাসিটা দেখে চাকলাদারের শরীর হিম হয়ে গেল। বলে কি লোকটা? ঠিক ওই উচ্চতা তার শরীরের। লোকটা প্রায়ই মানে সেই এই বাড়িতে

ঢোকা অবধি তার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে কী উদ্দেশ্যে। তাকে কঙ্কাল বানাবার মতলবে কি এখানে জায়গা দিয়েছে? চাকলাদারের আর খাওয়া হল না। তাই দেখে ভদ্রলোক বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "রান্না কি খারাপ হয়েছে?" অমনি চাকলাদার আবার খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। খাওয়া শেষ করে গাঙ্গুলি বলল, "আপনার ছবিটা কিন্তু অদ্ভুদ ধরনের।"

"তাই কি?" ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "অনেকে কয়েন জমায়, স্ট্যাম্প রাখে, আমার হচ্ছে এটা। আপনার অদ্ভুত মনে হচ্ছে কিন্তু একজন সাধারণ বাঙালিকে কয়েনের গল্প বলেন সেও বলবে অদ্ভুত।"

"কিন্তু কয়েন তো বিক্রি হয়, এগুলো কী কাজে লাগবে?"

প্রচুর দাম মশাই। ধরুন, আপনার কাছে শেকসপীয়রের ডান হাত আছে। এবার তার ঐতিহাসিক মূল্যটা ভাবুন? মোহনলালের শরীরটা পলাসির মাঠে পড়েছিল। আমার কাছে ওর অস্থিপঞ্জুর আছে। অন্যদের থেকে তার ফর্মেশনের মধ্যে একটা আলাদা কম্পোজিসন আছে।"

"সিরাজদৌল্লার মোহনলাল?" চাকলাদার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

"ইয়েস! বল্লালসেনের মাথার খুলি দেখবেন?"

"না, না, ঠিক আছে।" চাকলাদার সামলে নিল।

"আমাদের মানে হিন্দুদের সিস্টেমটার জন্য কিছু প্রিজার্ভ করা মুশকিল। চিতার আগুন সর্বগ্রামী। যাক, আপনারা তো কাল সকালেই যাবেন? যাওয়ার আগে দেখা হবে। শুভরাত্রি।" আচমকা কথা শেষ করে ভদ্রলোক উঠে গেলেন। পাশের দরজা দিয়ে যাওয়ার সময় চাকলাদারের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যে ওর মনে হল, শরীরের চামড়া, মাংস, রক্ত সব ঝরে গেছে সে একটা সাড়ে ছ'ফুট কঙ্কাল হয়ে বসে আছে।

চাকরটা সামনে থাকায় ওরা ওখানে কথা না বলে ওপরের ঘরে

ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই চাকলাদার ভেঙে পড়ল আমার প্রমোশন দরকার নেই, ইনক্রিমেন্ট চাই না আমি এখান থেকে এখনই পালাতে চাই গাঙ্গুলি।

"কী করে? লোকটার তোমাকে ভাল লেগেছে। ডেঞ্জারাস লোক।" গাঙ্গুলি ভাবছিল। চাকলাদার দ্রুত জানলার কাছে গিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করল। শিকগুলো খুলে ফেলা খুব অসম্ভব নয়। এখান দিয়ে নীচে লাফিয়ে নামা যায়। মাথা গলিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে ফণিমনসার ঝোপ, পড়লে সুবিধে হবে না। চাকলাদারের মনে পড়ল কেষ্টদার গল্পে পড়েছে যে একটা লোক তার হবির জন্য খুন করতে দ্বিধা করেনি। আর এক্ষেত্রে খুন করলে তো হাতে হাতে কঙ্কাল লাভ। কান্না পেয়ে গেল ওর।

"গাঙ্গুলি বলল, "ঘাবড়ে যেও না চাকু। এখানে আমাদের এনিমি হল দুজন লোক। একজন রোগা পটকা বেঁটে, আর একজন বৃদ্ধ চাকর। আমাদের দুটো রিভলভার আছে। অতএব আমরাই আপারহ্যাণ্ড নিতে পারি। আমার খুব সন্দেহ যে ছেলেটিকে আমরা ধরতে এসেছি সে এই বাড়িতেই আছে। এটা ঠিক কীনা দেখতে হবে।"

"কখন দেখবে? আমি মরে গেলে ও তোমাকে জ্যান্ত ফিরতে দেবে ভেবেছ?"

"আমার মত কঙ্কাল ওর দরকার নেই।"

"কিন্তু সাক্ষী, কেউ সাক্ষী ছেড়ে দেয়?"

"হুঁ।" গাঙ্গুলি এবার চিন্তিত হল, "শোনো আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণ করা ভাল। চলো যাই।" গাঙ্গুলি পকেট থেকে রিভলভার বের করে সেটা ঠিকঠাক করে নিল। বসে বসে মরে যাওয়ার চেয়ে এটা খারাপ নয়, চাকলাদার বলল, "কোথায়?"

"বাড়িটা সার্চ করব। কেউ বাধা দিলে গুলি করবে। সামনে কঙ্কাল পড়লে তাকাবে না। প্রথমে নীচের তলায় যে ঘরটায় লোকটাকে বারংবার যেতে দেখেছি ওই ঘরটায় চলো।" প্রায়

মরিয়া হয়ে চাকলাদার এক হাতে রিভলভার অন্যহাতে ব্যাগ নিয়ে গাঙ্গুলির সঙ্গে পা টিপে-টিপে দোতলা থেকে নেমে এল। খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার। চাকরটা নেই। পাশের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে ওরা ঢুকে দেখল একটা লম্বা প্যাসেজ। প্যাসেজের দুপাশে চারটে ঘর। প্রথম ঘরের দরজা খুলতেই অন্ধকারে চিমসে গন্ধ নাকে এল। নিশ্চয়ই বাতি জ্বালিয়ে থাকবে। ওরা তিন নম্বর ঘরের দরজার নীচ দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে সতর্ক হল।

দুদ্দাড় করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে গাঙ্গুলি চিৎকার করে উঠল, "হ্যাণ্ডস আপ। সামান্য নড়লেই গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।" গাঙ্গুলির গলা ও হাত কাঁপছিল। ভদ্রলোক তখন একটা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কালো কাপড় টেনে দিচ্ছিলেন। আচমকা এই আক্রমণে কোনওরকমে দুটো হাত ওপরে তুলে বললেন, "কী-কী ব্যাপার?"

"ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট। একশো তিনটে খুনের অপরাধ —না না হাত নামাবেন না। চাকু ওকে বেঁধে ফেল ওই দড়িটা দিয়ে।" ঘরের কোনে পড়ে থাকা একটা লম্বা দড়ি তুলে চাকলাদার এক লাফে কাছে গিয়ে ভদ্রলোককে বেঁধে বলল, "সাড়ে ছ'ফুটের খুব শখ অ্যাঁ?"

"আপনারা ভুল করছেন, এসব একদম, আইনমাফিক ব্যাপার।" ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন সমানে। চাকলাদার পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বের করে বলল, "লুক হিয়ার? উই আর পোলিস। শাট আপ ইওর মাউথ।"

ভদ্রলোককে এবার ঘাবড়ে যেতে দেখে গাঙ্গুলি বীরদর্পে টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়টা খুলে ফেলল। একটা লম্বা কাঠের বাক্স ওপরে কাঁচ দেওয়া আর তার মধ্যে কেউ শুয়ে আছে। উত্তেজিত গলায় সে ডাকল, "চাকু জলদি, কুইক।" চাকলাদার কাছে এসে ক্যাসকেসে গলায় বলল, "ডেডবডি। হুম্!" গাঙ্গুলি ততক্ষণে হিপ পকেট থেকে ছবিটা বের করে মিলিয়ে নিল,

'ইয়েস, সেম কেস। শুধু ডিকম্পোজড্ হয়ে গিয়ে সামান্য ফুলে গেছে।"

চাকলাদার বলল, "কাটা দাগটা।"

বডি ফুলে গেলে কাটা দাগ মিলিয়ে যায়। এই যে মশাই, এটা কোত্থেক পেলেন ?"

ভদ্রলোক খুব নার্ভাস গলায় বললেন, "ওটা আমি মানে আমার।"—

থাক থাক আর গুল মারবেন না। চাকু ডবল প্রমোশন। মার্ডারার প্লাস নিখোঁজ আসামী দুটোই ধরেছি। এখন এদুটোকে কি করে নিয়ে যাওয়া যায় ? গাঙ্গুলি চাকলাদারের দিকে তাকাতেই চাকলাদার লম্বা পা ফেলে ভদ্রলোকের মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করতেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

চাকরটাকে কবজা করতে অসুবিধে হল না। ভদ্রলোকের জীপটা গ্যারেজ থেকে বের করে একে একে কফিন এবং দুই আসামীকে তোলা হল। চাকরটাকে খুনের সহযোগী হিসেবে বিশবছর জেলে রাখা যাবে। দুজনেরই হাত পা ভাল করে বাঁধা। গাঙ্গুলি জীপ চালাচ্ছে। ভদ্রলোক এখনও বেঁহুস, চাকরটা ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। চাকলাদারের মনে এত আনন্দ হচ্ছিল সে গান গেয়ে চলল গুনগুন করে, "আমি বনফুল গো।"

চক্রধরপুর থানার ওসি ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। নিজেদের পরিচয় দিয়ে গাঙ্গুলি তার ওপর খুব তড়পালো, "আপনার এরিয়ায় একশো তিনটে খুন করল লোকটা আর আপনি ঘুমুচ্ছেন ?"

"ভদ্রলোককে দেখে ওসির চোখ কপালে উঠল, "আরে এ যে সদাশিব সেন। একে আনলেন কেন ?" ইনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, জঙ্গলে একা থাকে পড়াশুনার জন্য।"

"পড়াশুনা ?" ফ্যাক ফ্যাক করে হাসল চাকলাদার, খুন করার জন্য।"

সদাশিব সেনের জ্ঞান ফিরেছিল, বদ্ধ অবস্থায় তিনি বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা আমার অতিথি হয়ে এসে।"—

"থামুন।" গাঙ্গুলি চিৎকার করে উঠল, "আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ওই অফিসে আছে। ওসি ওটাকে পোস্টমর্টেম করতে পাঠান তাহলেই বোঝা যাবে কী করে মরে গেছে সুভাস।"

"সুভাষ! সুভাষ দত্ত? যে এখানে এসে লুকিয়েছে?" ওসি বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ। ওকে ধরতে এসে এই বিরাট ষড়যন্ত্র দেখতে পেলাম।" গাঙ্গুলি খুব গর্বের সঙ্গে বলল। কফিনটা টেবিলের ওপর রেখে একটা আলো আনা হল। গাঙ্গুলি পকেট থেকে ছবিটা বের করে ওসির হাতে দিল। কালো কাপড় সরিয়ে কাঁচের ঢাকনাটা খুলেই ওসি চেঁচিয়ে উঠলেন, "একি?"

"ফুলে গেছে বলে ওরকম দেখাচ্ছে কিন্তু মুখটা চিনতে পারবেন।" গাঙ্গুলি বলল। ওসি ততক্ষণে দুহাতে শরীরটাকে নামিয়ে নিয়ে সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। মাথার চুলের বদলে একটা কালো কাপড় বাঁধা। গায়ে পিঠখোলা ফতুয়া আর লুঙ্গি। ওসি খিঁচিয়ে উঠলেন, "এটাকে ডেডবডি বলছেন? মোমের পুতুল আর ডেডবডি এক?"

এবার ভদ্রলোক বললেন, "আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট। অস্থিপঞ্জরের ওপর মোম ঢেলে করেছি। এখনও কমপ্লিট হয়নি। আর অস্থিপঞ্জর? সেসব আসেপাশের গ্রামের মৃত মানুষের। লোকগুলো এত গরীব পয়সা পেলে দিয়ে দেয়। এর মধ্যে কোনও ক্রাইম নেই।"

ওসি ওদের দিকে ফিরে তাকাতেই দুজনে সুড়ুত করে থানা থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এখন শেষ রাত। আকাশে তারা সেঁটে আছে এখনও। চাকলাদার ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবে?"

"জাহান্নামে।" চাপা গলায় বলল গাঙ্গুলি।

"তারচেয়ে সেই ভোরের বাসটা ধরে ভুল জায়গায় না নেমে ঠিকঠাক টেবোতে নামলে কেমন হয়। একটা দিনের দেরিতে কী ক্ষতি হবে? জীবনে তো হাজার হাজার দিন পড়ে আছে। ঠিক মেক-আপ হয়ে যাবে, কী বলো?"

খুনী

এত তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যাবে বুঝতে পারেনি ওরা। কাউকে না বলে দশ মাইল দূরে পলাশবাড়িতে খেলতে এসেছিল হায়ারে, এখন সাইকেলে উঠে সন্তুর বুক ঢিপ-ঢিপ করছে, দীপুর মুখ শুকনো। দিনটাকে যদি হনুমানের মতো আর একটু ধরে রাখা যেত তাহলে পাঁই পাঁই করে ঠিক বাড়ি পৌঁছে যেতে পারত।

হাওয়ায় সাইকেল দুটো যেন উড়ছিল। পিচের রাস্তাটা মসৃণ এবং ঢালু। কিন্তু মরাঘাটের মোড় পার হতেই টুক করে সূর্যটা ডুবে গিয়ে সন্ধেটাকে ছুঁড়ে দিল চারপাশে। উত্তেজনায় ওরা এতক্ষণ কথা বলছিল না। সামনের রাস্তাটা যখন কালো হয়ে গেল, দুপাশে জঙ্গলের ঝিঁঝিঁগুলো যখন একসঙ্গে শব্দ করে উঠল তখন দীপু বলল, "আমি কিছু দেখতে পারছি না রে।" সন্তুর কপালে ঘাম কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা, ফিসফিসিয়ে বলল "জোরে চালা এই জঙ্গলে হাতি আছে।"

ডুয়ার্সের ওদিকটায় হাতির আনাগোনা বেশি। দীপু বলল, "তাহলে গান গাইতে গাইতে গাইতে চল।" বলেই "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" গাইতে লাগল কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে। মাথার ওপরে রাস্তার দুপাশের গাছের ঝাঁকড়া ডাল ছাদের মত ঝুলে আছে। তার গায়ে বসে থাকা পাখির চিৎকার ওদের গানের শব্দে যেন থেমে গেল আচমকা। অন্ধকারে তিনটে শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠল ঘাবড়ে গিয়ে।

বিনাগুড়ির মোড়টা পেরিয়ে গেল শাঁ করে। আর মাইল

চারেক। তারপর কোনোরকমে সাইকেল রেখেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া শুরু করে দেবে। একবার পড়তে আরম্ভ করলে বাবা আর কিছু বলবেন না, ওতে নাকি পড়ুয়ার মনোযোগ নষ্ট হয়। কিন্তু তার আগে বাবার মুখোমুখি হলো না-বলে সাইকেল নিয়ে সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকার জন্য—আরও জোরে প্যাডেলে চাপ দিল সন্তু। ওরা যখন "আজি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা" লাইনটায় পেঁাছেছে ঠিক তখনই ঘটে গেল ব্যাপারটা। দড়াম করে একটা শব্দ, সন্তুর মনে হল ও শূন্যে উঠে যাচ্ছে, সাইকেলের সিটটা পায়ের সঙ্গে জড়ানো। তারপরেই দুটো কনুই আর হাঁটু যেন থেঁতলে দিল পিচের রাস্তাটা। আর সেই-সময়েই গায়ে কাঁটা দেওয়া আর্তনাদ উঠল অন্ধকার কাঁপিয়ে। ভয়ে ব্যথায় সিঁটিয়ে ছিল সন্তু, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খানিক-বাদেই চাপা ডাক এল, "সন্তু, সন্তু, কোথায় তুই?"

আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করল সে। দীপুর গলা। কিন্তু সমস্ত শরীর কাঁপছে ওর এবং হাত পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। দীপুর কিছু হয়নি, বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে সে। "উঠে দাঁড়া, হেভি অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। তুই কেমন আছিস?"

কোনোরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু বলল, "ভাল।" সঙ্গে সঙ্গে ও টের পেল দু'হাত আর পা দিয়ে কিছু চটচটে জিনিস গড়িয়ে নামছে। রাস্তার একপাশে ওর সাইকেলটা কেমন বেঁকে পড়ে রয়েছে। দীপু সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে টানাটানি করতে করতে বলল, "হ্যাণ্ডেলটা ঘুরে গিয়েছে, চালাতে পারবি? জলদি পালানো দরকার। লোকটা বোধহয় মরে গিয়েছে।" সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল এবং এইসময় অন্ধকারেও সন্তু বুঝতে পারল রাস্তার এক-পাশে ছায়া-ছায়া একটা মানুষের শরীর নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। লোকটা অন্ধকারে চুপচাপ আসছিল আর সে ওকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছে। দীপুর তাগাদায় ও কোনরকমে

সাইকেলে চাপল। হাত পা জ্বলছে, চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কপাল থেকেও রক্ত ঝরছে। সাইকেলের পেছনের চাকা একটু বেঁকে যাওয়ায় খস-খস শব্দ হচ্ছে। লোকটার কাছ থেকে পালাতে চাইল ওরা। যদি ও মরে গিয়ে থাকে তাহলে পুলিস নিশ্চয়ই ওকে ধরবে। ফাঁসি কিংবা জেল হয়ে যাবে। সন্তু কী করবে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, "ও মরে গেছে?" দূরে আলো দেখা যাচ্ছে এখন। সাইকেলে গুম হয়ে বসে দীপু বলল, "হুঁ।"

"একবার ফিরে গিয়ে দেখবি?" সন্তুর শরীর ঠাণ্ডা, ব্যথাগুলো টের পাচ্ছে না।

"মাথা খারাপ!' বইতে পড়িসনি খুনীরা খুনের স্পটে ফিরে যায় বলেই ধরা পড়ে।"

'আমি খুনী নাকি!" প্রায় কেঁদে ফেলল সন্তু।

"পুলিস তাই বলবে। তোর সঙ্গে ছিলাম বলে আমিও বিপদে পড়ব। খুনীর হেল্পার। তাই তোর ধরা দেওয়া চলবে না। একটা প্লান করা দরকার।"

ওরা আলোর কাছাকাছি এসে যেতেই দীপু চমকে উঠল। "ইস্ কী চেহারা করেছিস। এভাবে বাড়িতে ঢুকবি কী করে?" সন্তু শুনে কেঁদে ফেলল।

দীপু আবার মাথা খাটাল। "বাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে সবাই টের পেয়ে যাবে। তারচেয়ে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে বোবা কম্পাউণ্ডারের কাছে চল, ওষুধ লাগানো দরকার।"

বোবা কম্পাউণ্ডার একলা থাকেন। সন্তুকে দেখে ওষুধ লাগিয়ে একটা কাগজে খসখস করে লিখলেন, "কী করে হল?" দীপু গোটা গোটা অক্ষরে পাশে লিখে দিল, "গাছ থেকে পড়ে গেছে।" একগাদা ট্যাবলেট নিয়ে ওরা চোরের মত বাড়ির সামনে এল। এখনও এদিকে ইলেকট্রিক আসেনি। দীপু অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "খবরদার কাউকে কিছু বলবি না। এখন স্কুল ছুটি, তাই বাঁচোয়া। বাড়ি থেকে একদম বের হবি না। যা খবর আমি দিয়ে যাব। এখন আমরা ক্রিমিন্যাল।"

ডিটেকটিভ বই সন্তুও পড়ে, বুঝতে অসুবিধে হল না। বাড়িতে ঢুকতেই মা চিৎকার করে উঠলেন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বাবার চোখ দেখে সন্তু বঝল, শরীরে ব্যাণ্ডেজ না থাকলে আজ আড়ংধোলাই খেতে হত।

সমস্ত শরীরে ব্যথা সন্তু ঘুমুতে পারছিল না। লোকটা মরে গেল। অন্ধকারে চুপচাপ আসার কী দরকার ছিল? ওরা অবশ্য ঘন্টি বাজায়নি কিন্তু গান গাইছিল তো, শোনেনি লোকটা? সে একটা লোককে খুন করে ফেলল! ইচ্ছে করে করেনি এটা পুলিসকে কী ভাবে বোঝাবে? বাবাকে সত্যি কথা বলে দেবে যদি কিছু ব্যবস্থা হয়? দীপুর উপদেশ মনে পড়ল, আগ বাড়িয়ে ধরা দেবার কোন মানে হয় না। এমনও তো হতে পারে লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। তাই যদি হয় রাত্তিরে কোন লরি ওকে চাপা দিয়ে যেতে পারে অথবা জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার খেয়ে ফেলতেও পারে। বাঘ নেই এদিকে, কিন্তু শেয়াল। শেয়াল কি মানুষ খায়? নেকড়ে তো আছে? শরীর জবজবে হয়ে গেল ওর।

সকাল সাতটা নাগাদ দীপু এল। বিজন মাস্টারের কাছে পড়তে যাওয়ার নাম করে বলে গেল কেউ কিছু টের পায়নি। এদিকে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, কেমন জ্বরোজ্বরো ভাব। এমন সময় একজন লোক ওকে ডাকতে এল। বাবা অফিসে চলে গেছেন, মা রান্নাঘরে। সন্তু তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে কোনোদিন এই ধরনের কোনও লোক খুঁজতে আসেনি কখনও। তাহলে কি সব ধরা পড়ে গেছে? লোকটি বলল, বোবা কম্পাউণ্ডার তার খোঁজ করছেন, এখনই যেতে বলেছেন। তার মানে হয়ে গেল। সন্তু ফ্যালফ্যাল করে চারপাশে তাকাল। এই চাঁপা ফুলের গাছ, মাঠ চা বাগান, বাবা-মা সবাইকে ছেড়ে জেলে যেতে হবে তাকে। কাউকে কিছু না বলে লোকটির সঙ্গে হাঁটতে লাগল সে। কাউকে দেখানোর মতো মুখ তার নেই। দীপুকে খবর দেওয়া দরকার। না, ওকে জড়িয়ে কী হবে।

চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে বোবাকম্পাউণ্ডারের বাড়িতে যেতে হয়। পুলিসের গাড়িটা সামনে নেই? সবাই কি ভেতরে বসে আছে। ও ঢুকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত কড়া পরিয়ে দেবে? তা ওরা ওদের বাড়িতেও আসতে পারত। বোধহয় বোবা কম্পাউণ্ডারের সাক্ষী চাইছে। সঙ্গের লোকটা ভেতরে ঢুকল না। সন্তু আড়ষ্ট পায়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রথমে বোবা-কম্পাউণ্ডারকে দেখতে পেল। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আর সেই সময় কে যেন তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়ে আধমরা হয়েই ছিল, সন্তু দু হাত তুলে সারেণ্ডার করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ও শুনল হাউ-মাউ করে কে ওর পায়ের সামনে বসে কাঁদছে। প্রচণ্ড বিস্ময়ে সন্তু দেখল কুলিগোছের একটা রোগা লোক দুটো হাত মুখের ওপর জোড়া করে বলল, 'মাপ কিজিয়ে খোকাবাবু, হাম থোড়া বেহোঁশি থা, আপকো বহুত চোট লাগায়া হাম। মাপ কিজিয়ে—।" হু হু করে কাঁদছিল লোকটা। সন্তু ঘাবড়ে গিয়ে দেখল লোকটার মুখচোখ ফুলে কেঁপে বীভৎস হয়ে গেছে। চোখ তো ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না। জামায় হাতে পায়ে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে।

এই লোকটাকে সে কাল ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছিল, অথচ আজ ও তার কাছে ক্ষমা চাইছে উলটে। সন্তুর চোখে জল এসে গেল, কোনোরকমে বলল, "নেহি, নেহি—।"

"হাম আপকো মার ডালা—কসুর মাপ কর দিজিয়ে।" লোকটা নাছোড়বান্দা।

এমন সময় বোবা কম্পাউণ্ডার আঙুল নেড়ে ডাকলেন। কাছে আসতে কাগজ নিয়ে খসখস করে লিখলেন, "তুমি মিথ্যেবাদী।"

কোনোরকমে ঘাড় নাড়ল সন্তু, হ্যাঁ।

খুশি হয়ে বোবা কম্পাউণ্ডার আবার লিখলেন, "কার ক্ষমা চাওয়া উচিত?"

হাত থেকে পেন্সিলটা নিয়ে বড় বড় করে সন্তু লিখল, "আ মা র"।